নভোরশ্মি

শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার

নভোরশ্মি

শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ কার্তিক ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বঙ্গভাষায় নভোরশ্মির (Cosmic Rays) পরিচয় প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে। যাঁহারা পদার্থ-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া এই রশ্মি সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবিদিত কোন নূতন বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট থাকার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পদার্থ-বিদ্যায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ এই রশ্মি সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলনের সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের অবগতির উদ্দেশ্যেই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই জন্য পদার্থবিদ্যাবিশারদগণের নিকট সুপরিচিত কতকগুলি বিষয়েরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে এই রশ্মি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনামূলক গবেষণাগুলির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করা হয় নাই। উক্ত রশ্মির মাত্র প্রধান কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও গবেষণাকারী সকল বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করা যায় নাই। এমন কি, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও সকলের গবেষণার সম্বন্ধে আলোচনা ও নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই, কারণ তাহাতে গ্রন্থের কলেবর অনাবশ্যক বর্ধিত হইত। ত্রুটিবাহুল্যাদি সত্ত্বেও যদি এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে কোনও কোনও তথ্য কাহারও নিকট নূতন ও জানিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

পদার্থবিদ্যাবিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ভাদ্র, ১৩৫৩

সূচীপত্র

অবতরণিকা	...	৭
নভোরশ্মির আবিষ্কার ও ধর্মনিরূপণ	...	১১
উইলসন কক্ষে নভোরশ্মির গমনপথের চিহ্ন	...	২১
পজিট্রনের আবিষ্কার	...	২৩
মেসোট্রনের আবিষ্কার	...	২৯
নভোরশ্মিজনিত বিস্ফোরণ ও দূরব্যাপী বর্ষণ	...	৩৭
নভোরশ্মির তড়িৎবিহীন অংশ	...	৪০
নভোরশ্মির উৎপত্তিপ্রণালী সম্বন্ধে পরিকল্পনা	...	৪৪

অবতরণিকা

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী সাধারণ আলোকরশ্মি ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের রশ্মির বিষয় আমরা অবগত আছি। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক রোয়ঞ্জেন (Röntgen) যে এক্স-রশ্মি (X-rays) বা অজ্ঞাত রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সাধারণ আলোকে অস্বচ্ছ বস্তু ভেদ করিয়া তাহার নির্গত হওয়ার ক্ষমতা থাকায় উহা মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ পীড়িত স্থানগুলির পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কোন কোন পীড়া আরোগ্য করিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এক্স্-রশ্মির নানাবিধ ধর্ম পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ জড়পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থ গুরুভার ও পজিটিভ তড়িৎকে বেষ্টন করিয়া লঘুভার নেগেটিভ তড়িৎবিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি লইয়া কিভাবে স্ব স্ব মার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবিরাম চলিতেছে, বা তাহাদের এক মার্গ হইতে অন্য মার্গে পতনে কিরূপ নির্দিষ্ট ধর্মবিশিষ্ট এক্স-রশ্মি উৎপন্ন হইতেছে, সে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এক্স্-রশ্মি ও সাধারণ আলোকরশ্মি কোন ভরবিশিষ্ট জড়পরমাণু নহে, উহাদিগকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের প্রায় ১/১০০০ অংশ হওয়ায় আলোকতরঙ্গ হইতে পৃথক্ উহার কতকগুলি ধর্ম আছে।

এক্স-রশ্মির সমজাতীয় কিন্তু ক্ষুদ্রতর তরঙ্গবিশিষ্ট এক প্রকার বিকিরণ রেডিয়ম প্রভৃতি কতকগুলি তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরমাণু হইতে অবিরত নির্গত হইতেছে। এই বিকিরণের নাম গামারশ্মি (γ-rays)। এই গামারশ্মির পদার্থ ভেদনক্ষমতা এক্স-রশ্মির অপেক্ষা অধিক, এজন্য মানব শরীরের অভ্যন্তরস্থ দুরারোগ্য ক্ষত আরোগ্য করার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত রশ্মির শক্তির পরিমাণ একটি বিশিষ্ট প্রথায় প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

এক্স-রশ্মি উৎপাদন করিতে হইলে কতকগুলি ইলেকট্রনকে তড়িচ্চালক শক্তি দ্বারা বেগবান্ করিয়া কোন কঠিন ধাতুর উপর আপতিত হইতে দিতে হয়; এইভাবে ইলেকট্রনগুলির বেগ সহসা প্রতিহত হওয়ায় বেগজনিত শক্তি বিকিরণে পরিণত হয়, ইহাই রোয়ঞ্জেন-রশ্মি বা এক্স-রশ্মি। ধাতুখণ্ডে প্রতিহত ইলেকট্রনের বেগ যতই অধিক হইবে, উৎপন্ন রশ্মির শক্তিও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইবে, এবং রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত ক্ষুদ্র হইবে। আপতিত ইলেকট্রনের শক্তি তাহার নিজ তড়িৎরাশি ও প্রযুক্ত তড়িচ্চালক শক্তি, এই উভয়ের গুণফলের সমান। অর্থাৎ, যদি ইলেকট্রন এক হাজার ভোল্ট তড়িচ্চালক শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহার শক্তি এক হাজার ইলেকট্রন-ভোল্ট (e. v.) ধরা হয়। ইহার প্রতিহত হওয়ার ফলে যে এক্স-রশ্মি উৎপন্ন হইবে, তাহার শক্তির পরিমাণও এক হাজার ইলেকট্রন-ভোল্ট ধরা হয়। মানবদেহ পরীক্ষা অথবা ক্ষত আরোগ্য করার জন্য যে এক্স-রশ্মি ব্যবহৃত হয়, তাহার শক্তি দুই লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক নহে। পূর্বে বর্ণিত গামারশ্মির শক্তি ৩২ হাজার হইতে ২৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত হইতে পারে। গামারশ্মির উৎপত্তি-প্রণালী এক্স-রশ্মির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এক্স-রশ্মি দুইটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রথম, ধাতুখণ্ডের উপর বেগবান্ ইলেকট্রন সহসা প্রতিহত হইলে বেগজনিত শক্তি বিকিরণে পরিণত হইয়া এক্স-রশ্মির উৎপাদন করে। দ্বিতীয়, ধাতুর উপর বেগবান্ ইলেকট্রনের আঘাতে উক্ত ধাতুর পরমাণু-কেন্দ্রকের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির কোন কোনটি বহিষ্কৃত হইয়া যায় ও উহাদের কতকগুলি এক মার্গ হইতে নিম্নতর শক্তিবিশিষ্ট মার্গে পতিত হওয়ায় উদ্বৃত্ত শক্তি এক্স-রশ্মিরূপ বিকিরণে পরিণত হয়। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় যদি ইলেকট্রনগুলিকে ১০ লক্ষ ভোল্টের অধিক তড়িচ্চালক শক্তিদ্বারা চালিত করা যায়, তাহা হইলে উৎপন্ন এক্স-রশ্মির ধর্ম গামারশ্মিরই অনুরূপ হইবে। বস্তুতঃ, এইরূপ এক্স-রশ্মি উৎপাদনের যন্ত্রও অধুনা নির্মিত হইয়াছে।

কোন কোন প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক হইতে স্বতঃই কিরূপে গামারশ্মি বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা কেন্দ্রকের গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা জানি প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে অতি অল্প স্থানে কেন্দ্রক অবস্থিত, এবং এই কেন্দ্রকে পজিটিভ তড়িৎরাশি তাহার চতুর্দিকে স্ব স্ব মার্গে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির নেগেটিভ তড়িৎরাশিদের সমষ্টির সমান। কেন্দ্রকের ভরের উপরই পরমাণুর ভার প্রধানতঃ নির্ভর করে, কারণ কেন্দ্রকের ভর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলির সমবেত ভরের প্রায় ৩৮০০ গুণ। হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক সর্বলঘিষ্ঠ। হাইড্রোজেন কেন্দ্রককে প্রোটন (proton) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রোটনে ক্ষুদ্রতম তড়িৎরাশি (charge) বর্তমান, উহার পরিমাণ ইলেকট্রনের নেগেটিভ তড়িৎরাশির সমান। প্রোটনের সমান ভারবিশিষ্ট অথচ তড়িৎহীন একটি কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাকে নিউট্রন (neutron) বলা হয়। বিভিন্ন সংখ্যায় নিউট্রন ও প্রোটন মিলিত হইয়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক গঠন করিয়াছে। হাইড্রোজেন হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রকগুলিতে ক্রমশঃ একটি করিয়া প্রোটন যুক্ত হইয়া ইউরেনিয়ম পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রক গঠিত হইয়াছে। যে কোন মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট, কিন্তু তাহার নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলিতেই একই তড়িৎরাশি বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন ওজনের কেন্দ্রক আছে। কেন্দ্রকের মধ্যে যতগুলি প্রোটন ও নিউট্রন আছে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভরের সমষ্টি কেন্দ্রকের ভর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। মিলিতভাবে কেন্দ্রক গঠনকালে প্রোটন ও নিউট্রনগুলি তাহাদের স্বকীয় ভরের সামান্য অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত করে, সেই শক্তিই উহাদিগকে কেন্দ্রকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে। কেন্দ্রকের নিউট্রন-প্রোটন সংখ্যানুপাতের উপর বন্ধনের দৃঢ়তা নির্ভর করে। ইউরেনিয়ম বা থোরিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক

এভাবে গঠিত যে উহা হইতে দুই প্রোটন ও দুই নিউট্রন দ্বারা গঠিত হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক, নামান্তরে আল্‌ফা-কণা (α-particle), ক্ষণে ক্ষণে স্বতঃই সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্‌ফা-কণা নির্গমনের পরেও ঐ দুইটি কেন্দ্রক স্থায়ী অবস্থায় আসে না। কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন ও প্রোটন পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্তী এবং নির্দিষ্ট শক্তি লইয়া স্ব স্ব ঘূর্ণাক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। আল্‌ফা-কণা নির্গমনের পর কেন্দ্রকের অতিরিক্ত শক্তি বিকিরণে পরিণত হইয়া গামারশ্মির উৎপাদন করে। থোরিয়ম কেন্দ্রক হইতে উৎপন্ন একটি স্বতোবিশ্লেষণশীল কেন্দ্রক হইতে প্রায় ২৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিশালী গামারশ্মি নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে।

স্বতোবিশ্লেষণশীল পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে গামারশ্মি ব্যতীত আর এক প্রকার রশ্মিও বিকীর্ণ হয়। যদি কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা স্থায়িত্বের উপযোগী সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হয় ও একটি ইলেকট্রনের তড়িৎযুক্ত অথচ ইলেকট্রনের কয়েকগুণ ভরবিশিষ্ট জড়কণা নির্গত হয় ; পরক্ষণেই সেটি এক দ্রুতগামী ইলেকট্রন ও একটি তড়িৎবিহীন দ্রুতগামী জড়কণায় বিভক্ত হইয়া যায়। দ্রুতগামী ইলেকট্রনটিকে বিটারশ্মি (β-rays) বলা হয়। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে নির্গত বিটারশ্মির মধ্যে বিভিন্ন বেগ বিশিষ্ট ইলেকট্রন পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক বেগবান্ ইলেকট্রনের শক্তি ৩১ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত হইতে পারে। বিটারশ্মি নির্গমনের পরেও কেন্দ্রকে উদ্বৃত্ত শক্তি থাকিলে পুনরায় কোন রশ্মি অথবা কণা নির্গত হয়।

উক্ত কয় প্রকার রশ্মি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক প্রকার বিকিরণ ঊর্ধ্ব দেশের সকল দিক্ হইতে ভূপৃষ্ঠে আপতিত হইতেছে। এই রশ্মির জড়পদার্থ ভেদন ক্ষমতা গামারশ্মি বা বিটারশ্মি অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। এই অতিভেদী রশ্মিকে 'কস্‌মিক' রশ্মি, বা নভোরশ্মি (cosmic rays) বলা হয়। এই রশ্মি সম্বন্ধেই পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচনা করা হইতেছে।

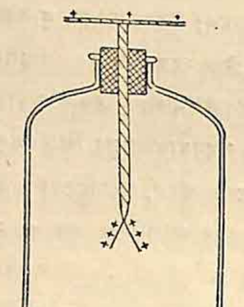
নভোরশ্মির আবিষ্কার ও ধর্মনিরূপণ

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় একই সময়ে সি. টি. আর. উইলসন (C. T. R. Wilson) নামক ইংরেজ ও গাইটেল (Geitel) নামক জার্মান বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে, কোন আবদ্ধ পাত্রের অভ্যন্তরে একটি তড়িৎনির্দেশক যন্ত্রকে তড়িৎযুক্ত করিয়া রাখিলে ক্রমশঃ উহার তড়িৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ বাতাস তড়িৎ-চালক নহে, সুতরাং উক্ত যন্ত্রের তড়িৎ বায়ুপথে অন্যত্র চালিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য বৈজ্ঞানিকদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোন ভেদনক্ষম অদৃশ্য রশ্মি উক্ত যন্ত্রমধ্যস্থ বায়ুর কিছু অণুকে বিপরীত তড়িৎবিশিষ্ট অংশদ্বয়ে আয়নিত (ionize) করে, ইহাদেরই কতকগুলি যন্ত্রস্থ বিপরীত তড়িৎদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে আপতিত হয় ও সমপরিমাণ বিপরীত দুই তড়িৎরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ সকল পদার্থের মধ্যেই স্বতোবিশ্লেষণশীল মৌলিক পদার্থগুলির কোন না কোন একটি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, ফলে তাহা হইতে নির্গত গামারশ্মি উল্লিখিতভাবে বায়ু আয়নিত করিয়া তড়িৎনির্দেশক যন্ত্রের তড়িৎবিনাশ ঘটাইতেছে। তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়, যখন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্ (Hess) নামক জনৈক জার্মান বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে, যদি উক্ত তড়িৎনির্দেশক যন্ত্র লঘু গ্যাসপূর্ণ ব্যোমযান বা বেলুনে (balloon) সংলগ্ন হইয়া ঊর্ধ্বে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ঊর্ধ্বে কিয়দ্দূর গমনের পরে যন্ত্রটি যতই ঊর্ধ্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই তড়িৎক্ষয়ের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তড়িৎক্ষয়ের জন্য দায়ী রশ্মি যদি ভূপৃষ্ঠের কোন বস্তু হইতে নির্গত হইত তাহা হইলে যন্ত্রটির ঊর্ধ্বে গমনের সঙ্গে তড়িৎক্ষয়ের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। সুতরাং হেস্ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, গামারশ্মির ন্যায় কোন রশ্মি ঊর্ধ্ব দেশের চতুর্দিক

হইতে ভূপৃষ্ঠে আপতিত হইতেছে ও তাহারই জন্য তড়িৎনির্দেশক যন্ত্রের তড়িৎ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হেসের এই আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই কোলহোর্স্টার (Kohlhörster) নামক আর একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক হেসের যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য একটি যন্ত্র বেলুনের সাহায্যে প্রায় ছয় মাইল উর্ধ্বে



চিত্র ১—তড়িৎনির্দেশক যন্ত্র

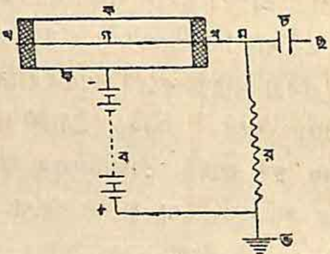
প্রেরণ করেন ও লক্ষ্য করেন যে, এই নূতন রশ্মির ভেদনক্ষমতা গামারশ্মির ভেদনক্ষমতার প্রায় ছয়গুণ অধিক। এই সময় বৈজ্ঞানিকগণ এই অতিভেদী রশ্মিকে গামারশ্মির ন্যায় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বলিয়া ধারণা করেন। ঐ ধারণারই বশবর্তী হইয়া বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মিলিকান (R. A. Millikan) গামারশ্মির ভেদনক্ষমতার সহিত ইহার ভেদনক্ষমতা তুলনা করিয়া ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হিসাব করেন। উক্ত উপায়ে নির্ধারিত অতিভেদী রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এরূপ ক্ষুদ্র যে ঐ রশ্মির শক্তি প্রায় ৪ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট হইতে পারে, এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতম গামারশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ১/৫০ অংশ মাত্র হইবে। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিরূপণের জন্য উল্লিখিত ও

অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ ভূপৃষ্ঠে আপতিত রশ্মির পরিমাণের সহিত গভীর খনি ও জলরাশির নিম্নে লক্ষিত ঐ রশ্মির পরিমাণের তুলনা করেন।

জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ হেসের আবিষ্কারের পর উক্ত রশ্মিকে 'হেস্-রশ্মি' নামে অভিহিত করেন। অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে 'কস্‌মিক রশ্মি' (cosmic rays) বা নভোরশ্মি এই আখ্যা দেন। হেস্ স্বয়ং প্রথমে ইহাকে 'ঊর্ধ্বদেশজাত রশ্মি' এই নাম দিয়াছিলেন, পরে যখন সকলে ইহাকে গামা-রশ্মির সমপ্রকৃতিক বলিয়া ধারণা করেন তখন ইহাকে 'অসাধারণ গামারশ্মি' এই নাম দিবার প্রস্তাব করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বোটে (Bothe) ও কোলহোয়র্স্টার নামক দুই জার্মান বৈজ্ঞানিকের আর একটি আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকগণের অতিভেদীরশ্মি বা নভোরশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই বৈজ্ঞানিকদ্বয় প্রমাণ করেন যে নভোরশ্মি গামারশ্মি জাতীয় নহে, বিটারশ্মিজাতীয়, দ্রুতগামী তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সমষ্টি। আবিষ্কারটি অতিশয় মূল্যবান্, কারণ ইহারই ফলে বৈজ্ঞানিকগণ নব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য নূতন যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া নব নব আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। বোটে ও কোলহোয়র্স্টার যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, উহার সম্বন্ধে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইতঃপূর্বে গাইগার (Geiger) এবং মুইলার (Müller) নামক দুই জার্মান বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন (২য় চিত্র)। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া দ্রুতগামী তড়িৎযুক্ত কণা পর পর চলিয়া যাইলে তাহাদিগের সংখ্যা গণনা করা যায়। চিত্রের **ক** একটি তাম্রের নল, **খ** উক্ত নলের মুখদ্বয় বদ্ধকারী দুইটি তড়িৎ-অপরিবাহী দ্রব্য, **গ** টংস্টেন ধাতুনির্মিত সূক্ষ্ম তার, **ঘ** তড়িৎ-অতিরোধক কুণ্ডলী (high resistance), **ব** তড়িচ্চালক শক্তি-উৎপাদক ব্যাটারি, **চ** তড়িৎধারক (condenser) ও **ভ** সিক্ত ভূমিভাগ। তামার নলটির মধ্যে সাধারণতঃ আর্গন গ্যাস বাহিরের বায়ুর চাপের প্রায় এক-শতাংশ চাপে পূর্ণ থাকে। সাধারণ অবস্থায় আর্গন তড়িৎ-অপরিবাহী

সুতরাং র চিহ্নিত রোধকে প্রথমে কোন তড়িৎপ্রবাহ থাকে না, উহার প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে তড়িৎবিভবের বৈষম্যও দেখা যায় না। কিন্তু যদি কোন তড়িৎযুক্ত কণা নলের অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যায় তাহা হইলে ঐ গ্যাসের কতকগুলি অণু সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রন ও একটি

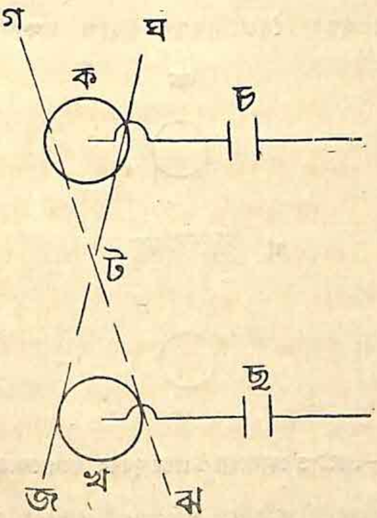


চিত্র ২—গাইগার-মুইলার গণকনল

পজিটিভ তড়িৎযুক্ত অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। ইলেকট্রনগুলি ব্যাটারির তড়িচ্চালক শক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া ধাবমান অবস্থায় সংঘর্ষের ফলে আরও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে উৎপন্ন বহুসংখ্যক ইলেকট্রন নলের অভ্যন্তরস্থ তারটির উপর আপতিত হয়, ফলে তারটির পজিটিভ তড়িৎবিভব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং চ চিহ্নিত তড়িৎধারকের বামপ্রান্তে সহসা কোন ব্যাটারির নেগেটিভ মেরু স্পর্শ করাইলে যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ঘটে। এই সময় রোধকের মধ্যে ক্ষণিক তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার ফলে টংস্টেন তার ও তাম্রনলের মধ্যে যে তড়িচ্চালক শক্তি কাজ করিতেছিল তাহার হ্রাস হয়। ঐ শক্তি কমিয়া গেলে আর্গনের মধ্যে ধাবমান ইলেকট্রনের বেগও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা সংঘর্ষ দ্বারা নূতন ইলেকট্রন আর উৎপন্ন করিতে পারে না, সুতরাং তড়িৎপ্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। আবার একটি তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণু নল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইলে উল্লিখিত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি হয়। তড়িৎধারকের দক্ষিণ প্রান্তটি যদি উপযুক্ত একটি যন্ত্রের

সহিত সংযুক্ত রাখা হয়, তাহা হইলে নলের মধ্য দিয়া যতগুলি তড়িৎযুক্ত কণা যাইবে তাহাদের সংখ্যা আপনিই লিপিবদ্ধ হইয়া যাইবে। এইজন্য এই যন্ত্রটির নাম গাইগার-মূইলার গণকনল (Geiger Müller counter tube)। ব্যাটারি হইতে যে তড়িচ্চালক শক্তি প্রয়োগ করিলে নলটি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হয় তাহা নলটির ব্যাসার্ধ, উহার অভ্যন্তরস্থ তারটির সূক্ষ্মতা ও গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

৩য় চিত্রে **ক** ও **খ** দুইটি গণকনলকে অনুভূমিক রাখিয়া একটির ঠিক উপর অন্যটি স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাদের **চ** ও **ছ** তড়িৎধারক দুইটি পৃথক্

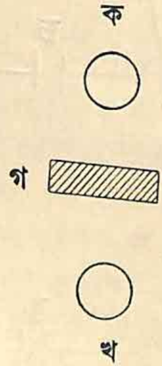


চিত্র ৩—যুগপৎ দ্বিনল-ভেদন গণক

দুইটি যন্ত্রের মধ্য দিয়া এমন ভাবে একটি তৃতীয় যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করা আছে যে কোন তড়িৎযুক্ত কণা নল দুইটির কোন একটিকে ভেদ করিয়া ধাবিত হইলে তৃতীয় যন্ত্রে কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু উভয় নলকে যুগপৎ

ভেদ করিলে তৃতীয় যন্ত্রে ক্ষণিকের জন্য ক্রিয়া হয়। এই যন্ত্র সজ্জায় গণকনল দুইটিকে যুগপৎ ভেদকারী তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্ম পরমাণুগুলির সংখ্যাই কেবল নির্ধারিত হইবে। এই যন্ত্র সমষ্টিকে 'যুগপৎ দ্বিনলভেদন-গণক' (twofold coincidence counter) বলা যায়। এইভাবে তিনটি নল ব্যবহার করিলে যন্ত্রসমষ্টিকে 'যুগপৎ ত্রিনলভেদন-গণক' বলা যাইবে।

বোটে ও কোলহোয়র্স্টার যুগপৎ দ্বিনলভেদন-গণক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লক্ষ্য করেন যে, নভোরশ্মির জন্য ঐ যন্ত্রে মিনিটে কয়েকবার ক্রিয়া হয়। পরে ৪র্থ চিত্রে দর্শিত উক্ত যন্ত্রের **ক** ও **খ** তাম্রনল দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে **গ** চিহ্নিত দেড় ইঞ্চি বেধ বিশিষ্ট একটি স্বর্ণপট্ট স্থাপন করায় যুগপৎ ভেদনের হার এক-চতুর্থাংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে

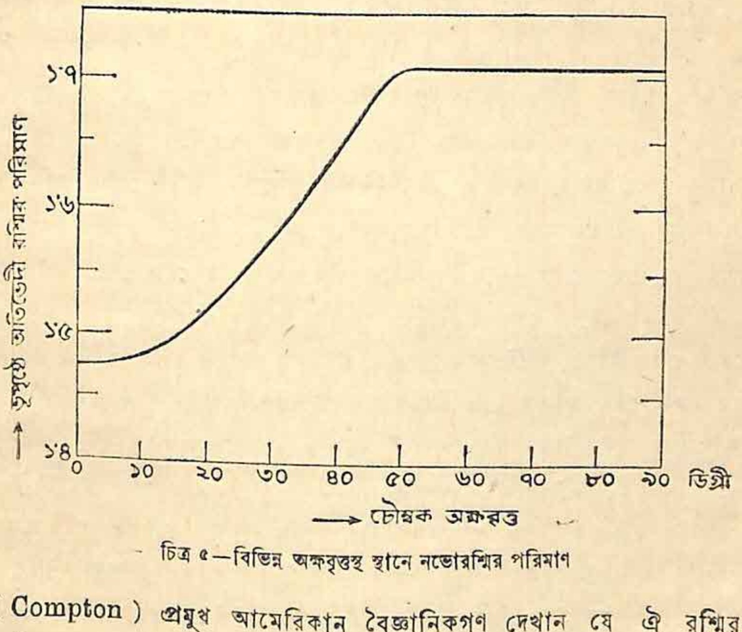


চিত্র ৪—বোটে ও কোলহোয়র্স্টারের যুগপৎ দ্বিনল-ভেদন গণক

তড়িৎ নির্দেশক যন্ত্র দ্বারা নভোরশ্মির পরিমাণ নির্ধারণ-কালে যন্ত্রটি দেড় ইঞ্চি পুরু স্বর্ণপট্ট দ্বারা আবৃত করিলে তাহাতেও আপতিত নভোরশ্মির পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং বোটে ও কোলহোয়র্স্টার এই সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁহাদের ব্যবহৃত গণকনল দুইটির যুগপৎ ভেদন সমস্তই নভোরশ্মি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। তাঁহারা আরও এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হন যে, নভোরশ্মি বেগবান্ তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সমষ্টি, কারণ এইরূপ কণাই ধাবমান অবস্থায় গতিপথের প্রত্যেক অংশে অবস্থিত পদার্থের পরমাণুগুলিকে সংঘর্ষের দ্বারা পরস্পর বিপরীত তড়িৎযুক্ত অংশদ্বয়ে আয়নিত করিতে পারে ও যুগপৎ দ্বিনল-ভেদন-গণক যন্ত্রের ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে, সাধারণ গামারশ্মির সেরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

বোটে ও কোলহোয়র্স্টারের এই আবিষ্কারের কিছুদিন পূর্বে হল্যাণ্ড-দেশীয় বৈজ্ঞানিক ক্লে (Clay) নিজ দেশে ও যবদ্বীপে নভোরশ্মির পরিমাণ তুলনা করিয়া লক্ষ্য করেন যে, উভয় স্থানে পরিমাণ সমান নহে। পরে কম্প্‌টন



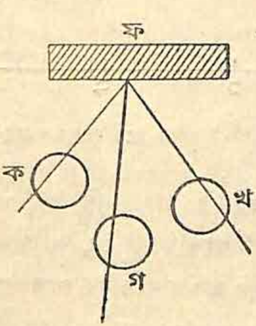
চিত্র ৫—বিভিন্ন অক্ষবৃত্তস্থ স্থানে নভোরশ্মির পরিমাণ

(Compton) প্রমুখ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকগণ দেখান যে ঐ রশ্মির পরিমাণ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষবৃত্তস্থ স্থানে বিভিন্ন। কি ভাবে বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানসমূহ হইতে ক্রমশঃ মেরুদেশের দিকে অগ্রসর হইলে নভো-

রশ্মির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা ৫ম চিত্রে দর্শিত হইয়াছে। মেরুপ্রদেশ হইতে ৪৫ ডিগ্রি অক্ষবৃত্তস্থ স্থান পর্যন্ত রশ্মির পরিমাণের কোন হ্রাসবৃদ্ধি নাই। বিষুবরেখার দিকে রশ্মির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানসমূহে মেরুপ্রদেশে লক্ষিত পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কম হয়। পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, সুতরাং তড়িৎযুক্ত কণা ইহার প্রভাবিত ক্ষেত্রের মধ্যে সবেগে অগ্রসর হইলে তাহার গতিপথ চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে বোটে ও কোলহোয়র্স্টার যখন প্রমাণ করিলেন যে নভোরশ্মি তড়িৎযুক্ত ধাবমান কণার সমষ্টি, তখন স্টোর্য়মার (Störmer), এপ্‌স্টাইন্ (Epstein), রসি (Rossi) এবং লেমায়টার ও ভেলার্টা (Lemaitre and Vallarta) পৃথিবীর দিকে বহুদূরবর্তী আকাশ হইতে উক্ত সূক্ষ্মপরমাণু সকল সবেগে আপতিত হইলে তাহাদের পরিমাণ বিভিন্ন অক্ষবৃত্তস্থ স্থানসমূহে কিরূপ হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে গবেষণা করেন। স্টোর্য়মার দেখাইলেন যে, যদি উক্ত রশ্মিকে নির্দিষ্ট বেগশক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সর্বদিক্ হইতে সমভাবে তাহারা পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা মেরু প্রদেশের দিকে এরূপ আকৃষ্ট হইবে যে, এক নির্দিষ্ট অক্ষবৃত্ত অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটতর কোন স্থানে উহারা আসিতে পারিবে না। লেমায়টার ও ভেলার্টা দেখাইলেন যে মেরুপ্রদেশ হইতে এক নির্দিষ্ট অক্ষবৃত্ত পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত স্থানগুলিতে আপতিত ইলেকট্রনের সংখ্যা পৃথিবীর চৌম্বক আকর্ষণে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবে না। যদি ইলেকট্রনগুলির বেগশক্তি ২০০০ কোটি (২×১০^{১০}) ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর চৌম্বক প্রভাবে তাহাদের গতিপথের কোনও পরিবর্তন হইবে না। আবার, ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছিতে হইলে ইলেকট্রনগুলিকে যে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিতে হয়, কেবল ৬০০ কোটি (৬×১০^{৯}) ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক শক্তিশালী ইলেকট্রনই তাহাতে সমর্থ হইবে এবং তাহারা উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নতম ৩৫ ডিগ্রি অক্ষবৃত্তস্থ

স্থানসমূহে পৌঁছিবে। নভোরশ্মি যদি ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র হয়, তাহা হইলে বিষুবরেখার নিকটতর স্থানসমূহে পৌঁছিতে হইলে ইলেকট্রনের বেগশক্তি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বে ৬০০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট অপেক্ষা বহুগুণ অধিক থাকার প্রয়োজন। মেরুপ্রদেশে ও বিষুবরেখার অঞ্চলে আপতিত ইলেকট্রনগুলির মধ্যে এই প্রভেদ হইবে যে, প্রথমগুলি ৬০০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট বা তদধিক যে কোন শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত ইলেকট্রন সকল ৬০০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে নভোরশ্মি কেবল দ্রুতগামী ইলেকট্রনেরই সমষ্টি নহে, উহাতে আরও কয়েক প্রকার সূক্ষ্মপরমাণু বর্তমান, যাহাদের উৎপত্তি প্রণালী সম্বন্ধে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

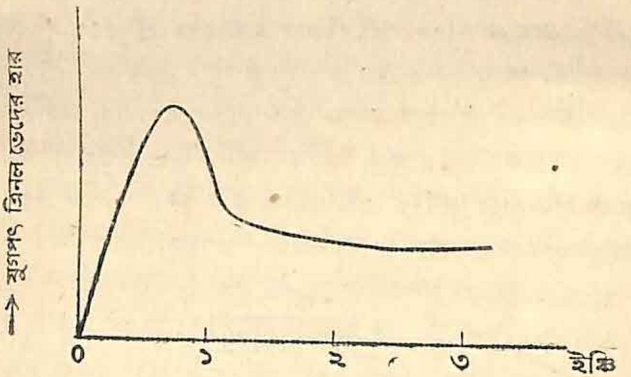
নভোরশ্মির অধিকাংশই তড়িৎযুক্ত দ্রুতগামী সূক্ষ্মপরমাণু, ইহার প্রমাণ পাওয়ার পর বৈজ্ঞানিকগণ জড় পদার্থের সহিত উক্ত রশ্মির সংঘর্ষে কিরূপ পরিবর্তন ঘটিতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথমে রসি তিনটি গাইগার-মুইলার গণককে ত্রিনলভেদন-গণকরূপে অনুভূমিক অবস্থায় পরস্পর



চিত্র ৬—রসির যুগপৎ ত্রিনল-ভেদন গণক যন্ত্র

সমান্তরালভাবে স্থাপন করিয়া ব্যবহার করেন (৬ষ্ঠ চিত্র)। এই ব্যবস্থায় তিনটি পৃথক্ তড়িৎযুক্ত কণা ক খ ও গ চিহ্নিত গণকনল তিনটিকে যুগপৎ

ভেদ না করিলে যন্ত্রে ক্রিয়া হইবে না। ইহার সাহায্যে রসি লক্ষ্য করেন, প্রথমতঃ গণকনলত্রয়ের উপরে কোন আবরক না থাকিলে যুগপৎ ত্রিনলভেদনের হার অতি অল্প হয়, কিন্তু উপরে ক চিহ্নিত সীসকপট্ট স্থাপিত করিলে উক্ত হার বৃদ্ধি পায়। পট্টের বেধ ক্রমশঃ বর্ধিত করিয়া ৩/৫ ইঞ্চি পর্যন্ত করিলে উক্ত হারও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উহা আরও বর্ধিত করিলে ঐ হার কমিয়া সর্বোচ্চ লক্ষিত হারের প্রায় অর্ধেক হইয়া যায়, কিন্তু তারপর বেধ বর্ধিত করিলেও হার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। আবরকের বেধের



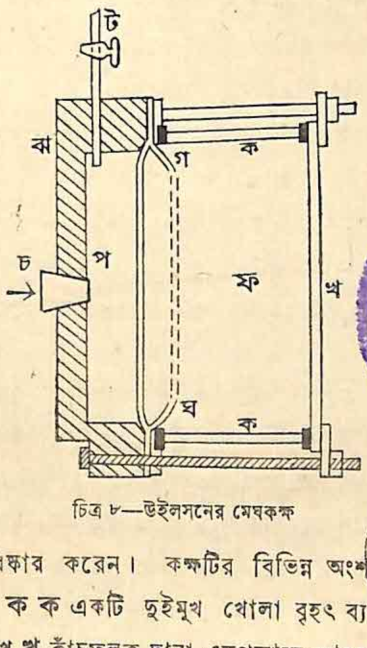
চিত্র ৭ বিভিন্ন বেধবিশিষ্ট সীসক খণ্ডে যুগপৎ পরমাণুত্রয়ের উৎপাদনের হার

সহিত যুগপৎ ত্রিনল-ভেদনের হার পরিবর্তন ৭ম চিত্রে দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ লক্ষ্য করিয়া রসি সিদ্ধান্ত করেন যে, আবরক ভেদনের সময় অতিভেদী রশ্মি কোন সীসক পরমাণুর সহিত সংঘর্ষের ফলে যুগপৎ তিনটি বা তদধিক বেগবান্ তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সৃষ্টি করে, তাহারাই ধাবিত হইয়া গণকনলত্রয়কে যুগপৎ ভেদ করে। এইরূপে উৎপন্ন একাধিক তড়িৎযুক্ত দ্রুতগামী সূক্ষ্মপরমাণুর সমষ্টিকে নভোরশ্মির বর্ষণ (cosmic ray shower) বলা হয়। আমরা পরে দেখিব, এই বর্ষণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

উইলসন কক্ষে নভোরশ্মির গমনপথের চিহ্ন

গাইগার-মুইলার গণকনল ব্যতীত আরও একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ নভোরশ্মি সম্পর্কে নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যন্ত্রটি সম্বন্ধে আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত রসির আবিষ্কারের বহুপূর্বে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উইলসন (C. T. R. Wilson) 'মেঘোৎপাদক কক্ষ' (cloud chamber) নামক



চিত্র ৮—উইলসনের মেঘকক্ষ

একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। কক্ষটির বিভিন্ন অংশ ৮ম চিত্রে সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে। ক ক একটি দুইমুখ খোলা বৃহৎ ব্যাসবিশিষ্ট খর্ব কাঁচের নল। ইহার একমুখ খ কাঁচফলক দ্বারা এরূপভাবে আবদ্ধ যে এই মুখ দিয়া বায়ুর যাতায়াত অসম্ভব। অপর মুখও ঝ-চিহ্নিত পিতলখণ্ডের উপর এভাবে

স্থাপিত যে ঐ স্থান দিয়াও বায়ু যাইতে পারে না। পিতলখণ্ডের অভ্যন্তরে **প**-চিহ্নিত কক্ষ কাঁচের নলের **ফ** কক্ষ হইতে একটি পুরু রবারের পাত (**গ ঘ**) দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত যে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে বায়ু চলাচল সম্ভব নহে। পিতলখণ্ডে দুইটি ছিদ্র; একটি **চ**, লঘুভার ধাতুখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ, অপরটি **ট** বায়ু প্রবেশ করাইবার যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত। এখন যদি **ফ** কক্ষটি বাহিরের বায়ুচাপের অধিক চাপযুক্ত আর্দ্র বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং তদপেক্ষাও অধিক চাপযুক্ত বায়ু দ্বারা **প** কক্ষটি পূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে মধ্যবর্তী **গ ঘ** রবারের পাতটি চাপবৈষম্যের ফলে ছিন্নরেখা দ্বারা দর্শিত কোন স্থানে অবস্থান করিবে, ফলে **ফ** কক্ষের আয়তন তাহার প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে। এই সময় অবশ্য **চ**-চিহ্নিত গুঁজিটি যন্ত্রের সাহায্যে চাপিয়া রাখার প্রয়োজন। অতঃপর যদি ঐ গুঁজি হঠাৎ খুলিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে **প** কক্ষ হইতে কিছু বাতাস সবেগে বাহির হইয়া যাইবে, ফলে **গ ঘ** রবারের পাতটি **প** কক্ষের দিকে ফিরিয়া আসিবে এবং **ফ** কক্ষের আয়তন হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধি পাইলে বায়ু কিঞ্চিৎ শীতল হয় এবং আর্দ্র বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্পের কিয়দংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। **ফ** কক্ষে এই উপায়ে উৎপন্ন মেঘের জলবিন্দুগুলির আয়তন অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র কিন্তু কক্ষমধ্যে তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণু থাকিলে তদুপরি গঠিত জলবিন্দুর আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। **ফ** কক্ষের হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে যদি একটি দ্রুতগামী তড়িৎ-যুক্ত সূক্ষ্মপরমাণু কক্ষের আর্দ্র বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে ঐ গতিপথে সংঘর্ষের ফলে বহু তড়িৎযুক্ত কণার সৃষ্টি হয়; উহাদের উপর অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর জলবিন্দু গঠিত হয় বলিয়া তীব্র আলোকপাতে ঐ পথ রেখারূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপে মেঘকক্ষের আলোকচিত্র লইলে বিটারশ্মির গমনপথ একটি সূক্ষ্ম রেখা, প্রোটনের তদপেক্ষা স্থূল ও আল্‌ফা-রশ্মির পথ স্থূলতর রেখারূপে দৃষ্ট হয়। আল্‌ফাকণায় প্রোটনের দ্বিগুণ তড়িৎ বর্তমান

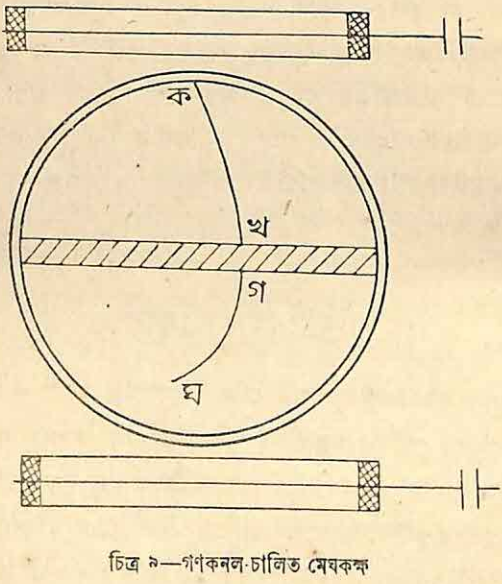
থাকায় তদুপরি অধিকসংখ্যক জলবিন্দু গঠিত হয়, সুতরাং উহার গমনপথ স্থূলতর রেখারূপে প্রতীয়মান হয়। বেগজনিত শক্তি সমান হইলেও ইলেকট্রনের মেঘকক্ষে উৎপাদিত রেখা কি কারণে প্রোটনের রেখা অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইবে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে নভোরশ্মি বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সমষ্টি কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য উইলসনের মেঘকক্ষই উপযুক্ত যন্ত্র। ইহার সাহায্যে নভোরশ্মির গমন পথের আলোকচিত্র প্রথমে গ্রহণ করেন স্কবেলজিন (Skobelzyn), পরে মিলিকান ও এণ্ডার্সন (C. D. Anderson) ইহা দ্বারা নভোরশ্মি সম্বন্ধে নানা তথ্যের আবিষ্কার করেন।

পজিট্রনের আবিষ্কার

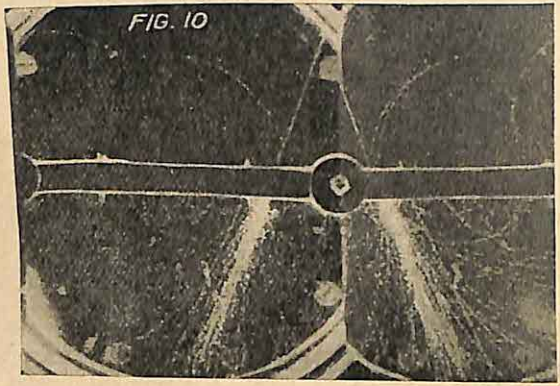
যদি উইলসন মেঘকক্ষকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এভাবে স্থাপিত করা হয় যে চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক শক্তিরেখাগুলি কক্ষের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে আসে (৯ম চিত্র) এবং এই অবস্থায় যদি একটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণু ঊর্ধ্ব হইতে আসিয়া কক্ষ ভেদ করিয়া যায়, তাহা হইলে গমনপথটি সরল রেখা না হইয়া ৯ম চিত্রে দর্শিত **ক খ গ ঘ** রেখার ন্যায় বক্র হইবে। যদি কক্ষের মধ্যস্থলে একখণ্ড সীসকপট্ট অনুভূমিক ভাবে স্থাপিত করা যায় এবং উল্লিখিত সূক্ষ্মপরমাণু যদি এই সীসকখণ্ড ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে সীসকখণ্ডের উপরের **ক খ** গমনপথের বক্রতা অপেক্ষা নীচের **গ ঘ** অংশের বক্রতা অধিক হইবে। তড়িৎযুক্ত কণাটির সীসক-ভেদনকালে বেগশক্তির কিয়দংশ ব্যয়িত হওয়ায় নির্গত কণা পূর্বাপেক্ষা মন্দগতি হইয়া পড়ে, সুতরাং চৌম্বকক্ষেত্রে তাহার গমনপথের বক্রতা অধিকতর হয়। চৌম্বকক্ষেত্র এরূপভাবে ক্রিয়াশীল হয় যে, সূক্ষ্মপরমাণুটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত

হইলে কক্ষমধ্যে তাহার গমনপথের বক্রতা চিত্রে দর্শিতের ন্যায় বাম দিকে না হইয়া তাহার বিপরীত দিকে হইবে। সীসক-ফলকটি উল্লিখিতরূপে স্থাপন করার ফলে অতিভেদী রশ্মির গমনপথের আলোকচিত্র হইতে আমরা জানিতে পারি ফলকের কোন্ পার্শ্ব হইতে রশ্মি কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কারণ সীসক

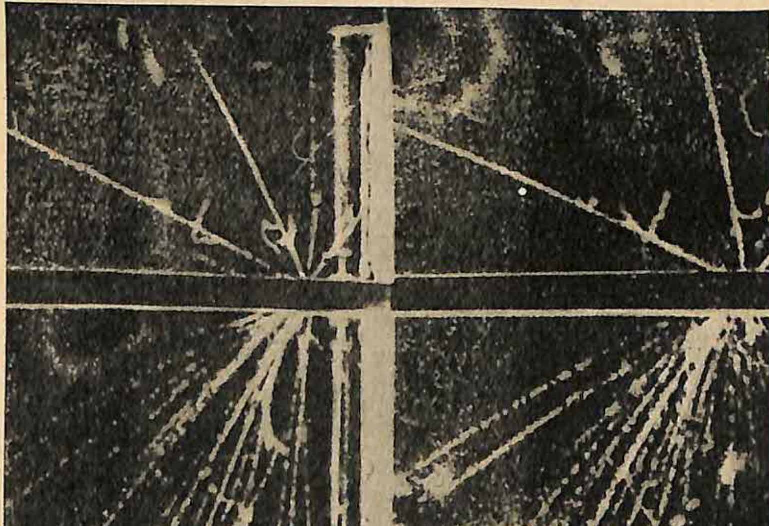


চিত্র ৯—গণকনল-চালিত মেঘকক্ষ

ভেদনের পূর্বে অধিকতর গতিবেগ থাকার জন্য সেই পার্শ্বের পথের বক্রতা অল্প হইবে। এতদ্ব্যতীত, গমনপথটি কোন্‌দিকে বাঁকিয়াছে তাহা দেখিয়া বেগবান কণাটি পজিটিভ অথবা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, তাহাও স্থির করা যায়। এরূপ ব্যবস্থায় একমাত্র অসুবিধা এই যে, মেঘকক্ষের সহসা আয়তনবৃদ্ধি ঘটাইয়া যে ক্ষণে মেঘ উৎপাদন করা হয়, ঠিক সেই ক্ষণেই যে একটি রশ্মি কক্ষ ভেদ করিয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং অনেক আলোকচিত্র লইলে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে রশ্মির পথচিহ্ন দৃষ্ট হইবে। এই অসুবিধাও



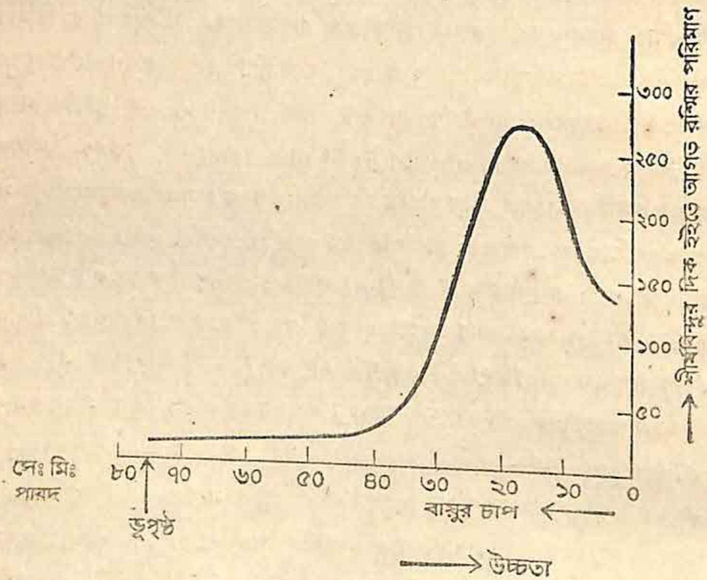
চিত্র ১০—চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত মেঘকক্ষের নিম্নার্ধে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন্‌ ও পজিট্রনের পরস্পর বিপরীত দিকে বক্রতাপ্রাপ্ত পথ দৃষ্ট হইতেছে।



চিত্র ১৪—মেঘকক্ষে স্থাপিত সীসকখণ্ডে নভোরশ্মি দ্বারা সংঘটিত বিস্ফোরণে উৎপন্ন পরমাণুগুলির মধ্যে কয়েকটি ঊর্ধ্বদিকে ধাবমান হইয়াছে।

দূর করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদি উইলসন কক্ষটিকে দুইটি গাইগার-মুইলার গণকনলের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয় (৯ম চিত্র), এবং এরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে উক্ত গণকনল দুইটির যুগপৎ ভেদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘকক্ষের আয়তনবৃদ্ধি ঘটিবে, অন্য সময়ে নহে, তাহা হইলে এইরূপে গৃহীত প্রত্যেক আলোকচিত্রেই নভোরশ্মির গমনপথের চিহ্ন লক্ষিত হইবে। এই উপায়ে প্রথমে ইংলণ্ডে ব্ল্যাকেট্ ও ওচিয়ালিনি (Blackett and Occhialini) নভোরশ্মির গমনপথের বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। পরে আমেরিকায় এণ্ডার্সন এইরূপ মেঘকক্ষ ব্যবহার করিয়া নভোরশ্মির ধর্ম নিরূপণকালে নূতন দুইপ্রকার তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটির নাম 'পজিট্রন' (positron) ও মেসোট্রন (mesotron)। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত গণকনলচালিত চৌম্বকক্ষেত্র বিশিষ্ট মেঘকক্ষের সাহায্যে অনেকগুলি অতিভেদীরশ্মির গমনপথের আলোকচিত্র লইয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে কতকগুলি পথচিহ্নের বক্রতা ইলেকট্রনের পথচিহ্নের বিপরীত দিকে। ইংলণ্ডে ব্ল্যাকেট্ও এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কারণ সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই এণ্ডার্সন এই মত বিজ্ঞাপিত করেন যে, উক্ত ভিন্নমুখী বক্র পথগুলি প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের সমভরবিশিষ্ট কিন্তু সমপরিমাণ বিপরীত তড়িৎ অর্থাৎ পজিটিভ তড়িৎবিশিষ্ট কোন নূতন সূক্ষ্মপরমাণুর গমনপথ। এই নূতন কণাকে এণ্ডার্সন পজিট্রন নামে অভিহিত করেন। এইরূপে পজিট্রনের আবিষ্কার হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ নভোরশ্মির অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। মেঘকক্ষে গৃহীত আলোকচিত্রের মধ্যে কতকগুলিতে পূর্ববর্ণিত নভোরশ্মির বর্ষণও দেখা যায় এবং বর্ষণোৎপন্ন সূক্ষ্মপরমাণুদিগের মধ্যে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০ম চিত্রে এইরূপ একটি বর্ষণের মধ্যে অনেকগুলি পজিট্রনের ও ইলেকট্রনের পরস্পর বিপরীত দিকে বক্রতাপ্রাপ্ত গমনপথের আলোকচিত্র দর্শিত হইয়াছে।

এণ্ডার্সন কিরূপে মেসোট্রন আবিষ্কার করিলেন তাহা বর্ণনার পূর্বে আমরা অপর একটী বিষয় আলোচনা করিব। ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে নভোরশ্মির পরিমাণ কিরূপ পরিবর্তিত হয় তাহা হেস্ ও কোলহোয়র্স্টার এবং পরে মিলিকান ও ফোয়্‌ৎসার (**Pfötzer**) বহু ঊর্ধ্বদেশ পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ফোয়্‌ৎসারের লক্ষিত বিভিন্ন উচ্চতায় রশ্মির পরিমাণ ১১শ চিত্রে

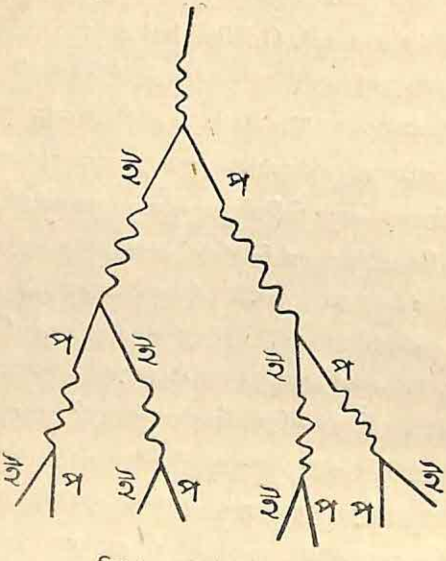


চিত্র ১১—ফোয়ট্সার কর্তৃক লক্ষিত ঊর্ধ্বদেশের বিভিন্ন স্থানে আপতিত নভোরশ্মির পরিমাণ

দর্শিত হইয়াছে। যেখানে বায়ুর চাপ অতি সামান্য সেখান হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে নভোরশ্মিকে অধিকতর চাপযুক্ত বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় এবং নভোরশ্মির তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সংখ্যাও নিম্নদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঊর্ধ্ব হইতে আসিয়া খ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছিলে অর্থাৎ যেখানে

বায়ুর চাপ প্রায় ১৬ সেন্টিমিটার পারদের চাপের সমান সেখানে পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। আরও নিম্নে ঐ পরিমাণ অতি দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ৪০ সেঃ-মিঃ পারদের চাপবিশিষ্ট স্থানে অবতরণ করিলে যে পরিমাণ লক্ষিত হয়, উহাপেক্ষা নিম্ন দেশে তাহা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কি প্রণালীতে আপতিত রশ্মির পরিমাণের এইরূপ পরিবর্তন ঘটে সে সম্বন্ধে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ভাবা (H. G. Bhabha) ও ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হাইট্লার (Heitler) এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের (Einstein) একটি মূল্যবান্ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। আইনস্টাইন বলেন, জড়পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া বিকিরণের শক্তিতে এবং বিকিরণের শক্তিও জড়পদার্থে পরিণত হইতে পারে ; যদি নির্দিষ্ট ভরের পদার্থ বিকিরণে রূপান্তরিত হয় তাহা হইলে বিকিরণ শক্তির পরিমাণ আলোকের বেগের বর্গফলের সহিত ঐ ভরের গুণফলের সমান হইবে। এই নিয়মে একটি ইলেকট্রনের সমুদয় ভর বিকিরণে পরিণত হইলে ঐ শক্তি প্রায় ৫লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট হইবে। পক্ষান্তরে প্রায় ১০লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট বা তদধিক শক্তির বিকিরণ পদার্থে পরিণত হইলে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন উৎপন্ন হইতে পারে। ভাবা ও হাইটলার পরিকল্পনা করেন যে নভোরশ্মির মধ্যে যেগুলি দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সমষ্টি তাহাদের সহিত জড়পদার্থের সংঘর্ষ হইলে প্রত্যেক ইলেকট্রনটি প্রথমে বিকিরণে পরিণত হয় এবং বিকিরণের তড়িৎবৈশিষ্ট্য না থাকায় তাহা হইতে যুগপৎ একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের তড়িৎরাশির পরস্পরে এরূপ সম্বন্ধ যে উভয়ের মিলিতাবস্থায় কোন তড়িৎ অবশিষ্ট থাকে না। বিকিরণ হইতে উৎপন্ন এই ইলেকট্রন ও পজিট্রন পদার্থ ভেদনকালে পুনরায় প্রত্যেকে বিকিরণে পরিণত হয় এবং সেই বিকিরণ হইতে পুনরায় ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগ্মের সৃষ্টি হয়। এই প্রণালীতে উচ্চশক্তিবিশিষ্ট একটি ইলেকট্রন অথবা গামারশ্মি হইতে

বহুসংখ্যক ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হইতে পারে। ১২শ চিত্রে এই প্রণালীতে নভোরশ্মির কিরূপে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে। চিত্রে মাত্র এক প্রকার বিকিরণের উৎপত্তিই দেখান হইয়াছে, কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রকের সহিত ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংঘর্ষে একাধিক



চিত্র ১২—প্রপাতবর্ষণ প্রণালী

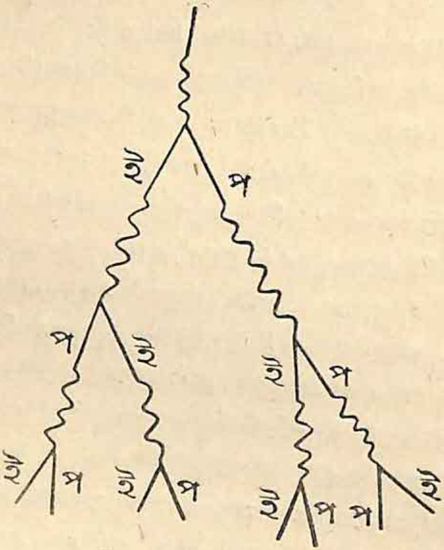
প্রকারের বিকিরণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, ফলে চিত্রে দর্শিত প্রণালী অপেক্ষা আরও অন্যভাবে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হইতে পারে। ১০ম চিত্রে এই পরিকল্পনা সমর্থিত হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে একটি মাত্র উচ্চ-শক্তিশালী ইলেকট্রন উপর হইতে মেঘকক্ষে প্রবেশ করিয়া সীসকখণ্ড ভেদন কালে অসংখ্য ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি করিয়াছে। ১২শ চিত্রে দর্শিত প্রক্রিয়াকে নভোরশ্মির প্রপাত-বর্ষণ (cascade shower production)

বলা হয়। ১১শ চিত্রে দর্শিত ভূপৃষ্ঠের নিকট নভোরশ্মির পরিমাণবৃদ্ধির অধিকাংশ এই প্রণালীতেই ঘটিয়া থাকে, ইহা অনেকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আপতিত নভোরশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন ও পজিট্রন অপেক্ষা মেসোট্রন অর্থাৎ গুরুভার ইলেকট্রন বা পজিট্রন সংখ্যায় সমধিক। এই মেসোট্রনের আবিষ্কার পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মেসোট্রনের আবিষ্কার

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে মেঘকক্ষে তড়িৎযুক্ত দ্রুতগামী সূক্ষ্মপরমাণুর গমনপথের যে রেখাচিত্র পাওয়া যায় তাহার প্রতি সেন্টিমিটারে ঘনীভূত জলবিন্দুর সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া পথচিহ্নটি ইলেকট্রন কিংবা আল্‌ফা রশ্মির ভেদনহেতু উৎপন্ন তাহা স্থির করা যায়। আল্‌ফা কণায় তড়িৎ রশ্মি ইলেকট্রন বা পজিট্রনের দ্বিগুণ হওয়ায় উহা জড়পদার্থের মধ্যে ধাবমান অবস্থায় অধিকসংখ্যক তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সৃজনে সমর্থ, সুতরাং তাহার পথচিহ্নে অনেক অধিক জলকণা লক্ষিত হয়। মেঘকক্ষের আলোকচিত্র দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, নভোরশ্মিতে আল্‌ফা কণা নাই এবং উহার সমস্ত তড়িৎযুক্ত কণাই ইলেকট্রন বা পজিট্রনের সমান তড়িৎযুক্ত। জ্ঞাত শক্তি সম্পন্ন চৌম্বকক্ষেত্রমধ্যে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ন্যায় তড়িৎযুক্ত কণার গমনপথের যে বক্রতা ঘটে তাহা হইতে উহাদের ভর এবং বেগের গুণফল জানা যায়। কোনও বিশেষ কণার ভর যদি ইলেকট্রনের ভরের সমান হয় তাহা হইলে উল্লিখিত বক্রতা হইতে তাহার বেগজনিত শক্তি পাওয়া যায়। আবার যদি মেঘকক্ষের অভ্যন্তরস্থ সীসকপট্ট ভেদ করিয়া কণাটি নির্গত হইয়া থাকে তাহা হইলে সীসকের উভয়পার্শ্বস্থ পথদুইটির বিভিন্ন বক্রতা তুলনা করিয়া সীসকখণ্ড ভেদনে ব্যয়িত শক্তিও জানা যায়। ব্ল্যাকেট্ ও ওচিয়ালিনি, এবং এণ্ডার্সন এইরূপে

বহুসংখ্যক ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হইতে পারে। ১২শ চিত্রে এই প্রণালীতে নভোরশ্মির কিরূপে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে। চিত্রে মাত্র এক প্রকার বিকিরণের উৎপত্তিই দেখান হইয়াছে, কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রকের সহিত ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংঘর্ষে একাধিক



চিত্র ১২—প্রপাতবর্ষণ প্রণালী

প্রকারের বিকিরণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, ফলে চিত্রে দর্শিত প্রণালী অপেক্ষা আরও অন্যভাবে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হইতে পারে। ১০ম চিত্রে এই পরিকল্পনা সমর্থিত হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে একটি মাত্র উচ্চ-শক্তিশালী ইলেকট্রন উপর হইতে মেঘকক্ষে প্রবেশ করিয়া সীসকখণ্ড ভেদন কালে অসংখ্য ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি করিয়াছে। ১২শ চিত্রে দর্শিত প্রক্রিয়াকে নভোরশ্মির প্রপাত-বর্ষণ (cascade shower production)

বলা হয়। ১১শ চিত্রে দর্শিত ভূপৃষ্ঠের নিকট নভোরশ্মির পরিমাণবৃদ্ধির অধিকাংশ এই প্রণালীতেই ঘটিয়া থাকে, ইহা অনেকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আপতিত নভোরশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন ও পজিট্রন অপেক্ষা মেসোট্রন অর্থাৎ গুরুভার ইলেকট্রন বা পজিট্রন সংখ্যায় সমধিক। এই মেসোট্রনের আবিষ্কার পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মেসোট্রনের আবিষ্কার

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে মেঘকক্ষে তড়িৎযুক্ত দ্রুতগামী সূক্ষ্মপরমাণুর গমনপথের যে রেখাচিত্র পাওয়া যায় তাহার প্রতি সেণ্টিমিটারে ঘনীভূত জলবিন্দুর সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া পথচিহ্নটি ইলেকট্রন কিংবা আল্‌ফা রশ্মির ভেদনহেতু উৎপন্ন তাহা স্থির করা যায়। আল্‌ফা কণায় তড়িৎ রশ্মি ইলেকট্রন বা পজিট্রনের দ্বিগুণ হওয়ায় উহা জড়পদার্থের মধ্যে ধাবমান অবস্থায় অধিকসংখ্যক তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুর সৃজনে সমর্থ, সুতরাং তাহার পথচিহ্নে অনেক অধিক জলকণা লক্ষিত হয়। মেঘকক্ষের আলোকচিত্র দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, নভোরশ্মিতে আল্‌ফা কণা নাই এবং উহার সমস্ত তড়িৎযুক্ত কণাই ইলেকট্রন বা পজিট্রনের সমান তড়িৎযুক্ত। জ্ঞাত শক্তি সম্পন্ন চৌম্বকক্ষেত্রমধ্যে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ন্যায় তড়িৎযুক্ত কণার গমনপথের যে বক্রতা ঘটে তাহা হইতে উহাদের ভর এবং বেগের গুণফল জানা যায়। কোনও বিশেষ কণার ভর যদি ইলেকট্রনের ভরের সমান হয় তাহা হইলে উল্লিখিত বক্রতা হইতে তাহার বেগজনিত শক্তি পাওয়া যায়। আবার যদি মেঘকক্ষের অভ্যন্তরস্থ সীসকপট্ট ভেদ করিয়া কণাটি নির্গত হইয়া থাকে তাহা হইলে সীসকের উভয়পার্শ্বস্থ পথদুইটির বিভিন্ন বক্রতা তুলনা করিয়া সীসকখণ্ড ভেদনে ব্যয়িত শক্তিও জানা যায়। ব্ল্যাকেট্ ও ওচিয়ালিনি, এবং এণ্ডার্সন এইরূপে

বহু পরীক্ষা দ্বারা নভোরশ্মির ব্যয়িত শক্তির পরিমাপ করেন। ভেদনকালে পদার্থের পরমাণুর সহিত বেগবান ইলেকট্রনের সংঘর্ষ দ্বারা পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্কৃত হইলে এই প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শক্তি কিভাবে পূর্বোক্ত ইলেকট্রনটির বেগের উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে প্রথমে টম্‌সন (J. J, Thomson) ও পরে বোর (Niels Bohr), বেটে (Bethe), উইলিয়ম্‌স্ (E. J. Williams), মোয়লার (Möller), ওপেনহাইমার (Oppenheimer) এবং ব্লক (Block) প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক বিবিধ গবেষণা করেন। ফলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, ধাবমান ইলেকট্রনের বেগ অতি অল্প হইলে পদার্থ ভেদনকালে প্রতি সেন্টিমিটারে উহার যে শক্তি ব্যয়িত হয়, বেগ ক্রমশঃ অধিক হইলে সে অনুপাতে শক্তি ব্যয় কম হইবে। এইরূপে ইলেকট্রনের বেগশক্তি ক্রমশঃ ১৬ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট হইলে ভেদনকালে প্রতি সেন্টিমিটারে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ন্যূনতম হইবে, বেগ আরও অধিক হইলে পুনরায় বেগবৃদ্ধির সহিত ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। ব্ল্যাকেট্ ও এণ্ডার্সন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত মেঘকক্ষের আলোকচিত্র পরীক্ষা করিয়া পূর্বোক্ত পরিকল্পনা প্রথমে সমর্থন করেন। কিন্তু পরে তাঁহারাই লক্ষ্য করেন যে, রশ্মিগুলিকে দ্রুতগামী ইলেকট্রন ধরিয়া লইলে যে ইলেকট্রনগুলির বেগশক্তি তিন কোটি ও পঁচিশ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টের অন্তর্গত তাহাদের সীসক ভেদনকালে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ পরিকল্পিত পরিমাণের অনেক অধিক। তাঁহারা তখন এই মত প্রকাশ করেন যে, যদি ঐ রশ্মিগুলিতে ইলেকট্রন ও পজিট্রন ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পদার্থ ভেদনকালে রশ্মির শক্তি পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্করণ ব্যতীত অন্য প্রক্রিয়া দ্বারাও ব্যয়িত হইয়া থাকে। একটি প্রক্রিয়া পূর্বে বিদিত ছিল,—ভেদনকালে দ্রুতগামী ইলেকট্রনের বেগ সহসা প্রতিহত হইয়া বিকিরণ। বর্তমান ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রনের শক্তিব্যয় সঙ্গত ও পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় কিনা তাহা উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকগণ

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ বেগ-প্রতিহতিজনিত বিকিরণে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ বেগবান ইলেকট্রনের কোন্ কোন্ ধর্মের উপর নির্ভর করা সম্ভব, বেটে ও হাইটলার তাহার তত্ত্বীয় গবেষণা করেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোন ধাবমান তড়িৎযুক্ত কণার বেগ প্রতিহত হওয়ার ফলে ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ উহার ভর ও বেগ উভয়েরই উপর নির্ভর করে। উক্ত কণার বেগজনিত শক্তি এক কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক হইলে সীসক ভেদনকালে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ সংঘর্ষ দ্বারা পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্করণের প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। তাঁহারা আরও প্রমাণ করেন যে, উক্ত তড়িৎযুক্ত কণাগুলি যদি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে তাহা হইলে যেগুলির বেগজনিত শক্তি ২৫ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট অপেক্ষা অধিক, বায়ুস্তর ভেদনকালে তাহাদের ব্যয়িত শক্তির অধিকাংশই বিকিরণ উৎপাদন করিবে, পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্করণে অতি সামান্য অংশই ব্যয়িত হইবে। এই কারণেই ২৫ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক শক্তি বিশিষ্ট নভোরশ্মি দ্বারা মেঘকক্ষে উৎপন্ন পথচিহ্নগুলির প্রতি সেন্টিমিটারে জলবিন্দুর সংখ্যা বিভিন্ন শক্তির জন্য প্রায় সমান দৃষ্ট হয়।

ব্ল্যাকেট ও এণ্ডার্সন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ নভোরশ্মিকে দ্রুতগামী ইলেকট্রন কল্পনা করিয়া যেগুলির শক্তি এক কোটি ও ২৫ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টের মধ্যবর্তী, তাহাদের মেঘকক্ষে উৎপন্ন গতিপথের প্রতি সেন্টিমিটারে উৎপন্ন জলবিন্দুর সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, রশ্মিগুলিকে ইলেকট্রন বলিয়া ধরিলে টম্‌সন, বোর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের পরিকল্পনা অনুসারে জলবিন্দুর সংখ্যা যেরূপ হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক। মেঘকক্ষস্থ সীসকখণ্ড ভেদনে উহাদের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া আরও লক্ষ্য করেন যে, বেটে ও হাইটলারের পরিকল্পনা অনুসারে এইরূপ শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রনের বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যতখানি শক্তি ব্যয়িত হওয়া উচিত, তদপেক্ষা কম হইতেছে। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে,

এরূপ অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনের বিকিরণ প্রক্রিয়ায় শক্তিব্যয় বেটে ও হাইটলারের পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত হয় না। অপর কেহ কেহ রশ্মির এই কণাগুলিকে ইলেকট্রন নয় বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং দ্রুতগামী প্রোটন হইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু মেঘকক্ষে উহাদের গতিপথে উৎপন্ন প্রতি সেন্টিমিটারে জলবিন্দুর সংখ্যা উহারা প্রোটন হইলে যেরূপ হইত তাহা অপেক্ষা অনেক কম এইরূপ দেখা যায়। তখন এণ্ডার্সন অনুমান করেন যে উক্ত কণাগুলি দ্রুতগামী কোন নূতন সূক্ষ্মপরমাণু হইতে পারে। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, যদি এই রশ্মিগুলিকে ইলেকট্রনের প্রায় ২০০ গুণ ভরবিশিষ্ট অথচ সমপরিমাণ নেগেটিভ বা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত নূতন কণা ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মেঘকক্ষে উৎপন্ন গতিপথে পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্করণে এবং পরিকল্পনানুযায়ী বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যত যত শক্তি ব্যয়িত হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ হইয়া থাকে। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, যে সকল রশ্মি মেঘকক্ষে প্রপাতবর্ষণ সৃষ্টি করে, তাহাদের পদার্থভেদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িতশক্তির পরিমাণ রশ্মিগুলিকে ইলেকট্রন ধরিয়া বোর-হাইটলার পরিকল্পনানুযায়ী যতখানি হওয়া উচিত তাহাই হয়, কিন্তু অন্যগুলির ঐরূপ শক্তিব্যয় হইতে পৃথক্। নভোরশ্মিগুলির মধ্যে যে দুই জাতীয় সূক্ষ্ম পরমাণু আছে, সে বিষয়ে এণ্ডার্সন তখন নিঃসন্দেহ হইলেন। শেষোক্ত যেগুলির ভর ইলেকট্রনের প্রায় ২০০ গুণ ধরিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে তিনি 'মেসোট্রন' (mesotron) এই আখ্যা দেন। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে মেসন (meson) নাম দিয়াছেন।

মেসোট্রনের ভর নানা উপায়ে নির্ধারিত হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মেঘকক্ষ ভেদনকালে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে মেসোট্রনের গমনপথের যে বক্রতা ঘটে তাহা হইতে উহার ভর ও বেগের গুণফল পাওয়া যায়। সুতরাং কোন উপায়ে উহার বেগজনিত শক্তি মাপিতে পারিলে উক্ত গুণফল হইতে মেসোট্রনের ভরও নির্ধারিত হইবে। প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে এই বেগজনিত

শক্তি মাপা যায়। প্রথম, যদি মেসোট্রনটি মেঘকক্ষে সীসক ভেদনকালীন সংঘর্ষের ফলে সম্পূর্ণ বেগশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আলোকচিত্রে গতিপথের শেষাংশের দৈর্ঘ্য মাপিয়া উহার বেগজনিত শক্তি হিসাব করা যায়। দ্বিতীয়, মেঘকক্ষে স্থাপিত সীসক ভেদ করিয়া মেসোট্রন যদি নির্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সীসকখণ্ডের উভয়পার্শ্বস্থ পথদ্বয়ের বক্রতার অনুপাত হইতে বেটে ও হাইটলারের পরিকল্পনার সাহায্যে শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়, মেঘকক্ষ ভেদ করিয়া মেসোট্রন নির্গত হওয়ার প্রায় অর্ধ সেকেণ্ড পরে যদি গতিপথের অলোকচিত্র লওয়া হয়, তখন পথস্থিত ঘনীভূত জলবিন্দুগুলি গণনা করার সুবিধা হয়, এবং প্রতি সেণ্টিমিটারে জলবিন্দুর সংখ্যা হইতে উহার পরমাণু হইতে ইলেকট্রন বহিষ্করণে ব্যয়িত শক্তির নির্ণয় করা যায়, এবং বোর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের এক পরিকল্পনা ও তত্ত্বীয় গবেষণার সাহায্যে গতিবেগও জানা যায়। উল্লিখিত প্রথম দুইটি উপায়ে এণ্ডার্সন এবং তৃতীয় উপায়ে কর্সন (Corson) এবং ব্রোড (Brode) মেসোট্রনের বেগ এবং তাহা হইতে ভর নির্ণয় করিয়াছেন।

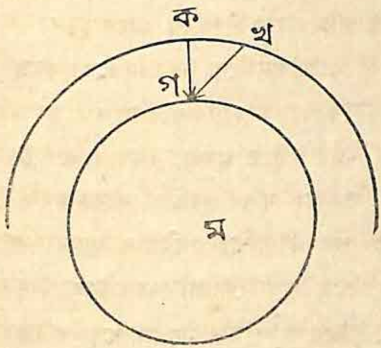
অপর একটি উপায়ে উইলসন (Wilson) এবং ল-প্রিন্স-রিংগে (Leprince-Ringuet) ও ক্রুসার (Crussard) মেসোট্রনের ভর নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে মেঘকক্ষ ভেদনকালে মেসোট্রনের সহিত তন্মধ্যস্থ কোন কোন পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে পরমাণুটির কোন একটি ইলেকট্রন নির্দিষ্ট বেগে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেইক্ষণে আলোকচিত্র লইতে পারিলে ঐ চিত্র হইতে মেসোট্রনের ভর প্রোটনের ভরের কত অংশ তাহা মোটামুটি অনুমান করা যায়। পঞ্চম একটি উপায়ে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বসু এবং চৌধুরী (D. M. Bose and Miss B. Chowdhury) মেসোট্রনের ভর নির্ণয় করিয়াছেন। আলোকচিত্র লওয়ার জন্য যে ফিল্ম্ (film) ব্যবহার হয়, সেইরূপ ফিল্ম্ তাঁহারা উচ্চ পর্বতের উপর আলোক হইতে আবৃত করিয়া খাড়া অবস্থায় দীর্ঘকাল রাখিয়া দেন। পরে উপযুক্ত

রাসায়নিকের মধ্যে সেগুলিকে ডেভেলপ্ করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি নভোরশ্মি ফিল্মেরই কোন কোন পরমাণুর কেন্দ্রকের সহিত সংঘর্ষের ফলে কয়েকটি মেসোট্রন উৎপাদন করিয়াছে, উহারা এক এক বিন্দু হইতে ফিল্মের মধ্য দিয়া নিম্নে ধাবিত হইয়া ফিল্মের উপর হ্রস্বদীর্ঘ কৃষ্ণ রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। ফিল্মটিতে কি কি মৌলিক পদার্থ যৌগিক অবস্থায় বর্তমান এবং আপতিত রশ্মির গমন পথের সহিত মেসোট্রনের গমন পথ কতটুকু কোণ উৎপাদন করিয়াছে, ইহা জানা হইলে মেসোট্রনের বেগজনিত শক্তি নির্ণয় করা যায়। এইভাবে কতকগুলি মেসোট্রনের বেগশক্তি নির্ধারণের পর তাঁহারা ফিল্মের কৃষ্ণ রেখাগুলিতে প্রতি সেন্টিমিটারে ফিল্মের অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক পদার্থের কতগুলি কণা কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা গণনা করেন। এই কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত কণার সংখ্যা মেসোট্রনের বা প্রোটনের গতি-বেগের উপর নির্ভর করে, ভরের উপর করে না। সুতরাং তাঁহারা ফিল্মের উপর নির্ধারিত বেগের প্রোটন দ্বারা উৎপাদিত রেখায় কৃষ্ণবর্ণ কণাগুলির সংখ্যার সহিত মেসোট্রন কর্তৃক চিহ্নিত রেখায় ঐ সংখ্যার তুলনা করিয়া কোন্ বিশেষ বেগবিশিষ্ট প্রোটনের অঙ্কিত রেখা একটি মেসোট্রনের অঙ্কিত রেখার সদৃশ তাহা দেখিয়া মেসোট্রনটির বেগ জানিতে সমর্থ হন। বেগ এবং বেগজনিত শক্তি এইভাবে নির্ণীত হইলে মেসোট্রনের ভর তাহা হইতে হিসাব করা যায়। ফিল্মে যে এইরূপ নভোরশ্মির পথ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রথমে ব্লাউ ও ওয়াম্বেকার (Blau and Wambacher) লক্ষ্য করেন।

বিভিন্ন প্রণালীতে নির্ণীত মেসোট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের ১৫০ গুণ হইতে ৩০০ গুণেরও অধিক হইতে পারে এইরূপ দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মেসোট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ২০০ গুণ। সম্প্রতি আমেরিকায় কম্প্টন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নভোরশ্মির মধ্যে লঘুভার মেসোট্রনও থাকিতে পারে, পরীক্ষা হইতে এরূপ অনুমান করিতেছেন। লঘু মেসোট্রনগুলির ভর ইলেকট্রনের ভরের ২০ হইতে ৩০ গুণ হইতে পারে।

মেসোট্রন ইলেকট্রনের ন্যায় স্থায়ী কণা নহে। উৎপন্ন হওয়ার অতি অল্পক্ষণের মধ্যে উহারা স্বতোবিশ্লিষ্ট হইয়া প্রত্যেকে একটি ইলেকট্রন ও একটি তড়িৎহীন কণায় পরিণত হয়। মেসোট্রন যে এইরূপ ক্ষণজীবী ও স্বতো-বিশ্লেষণশীল হইবে ইহা জাপানী বৈজ্ঞানিক য়ুকাওয়া (Yukawa) পূর্ব হইতে অনুমান করিয়াছিলেন।

মেসোট্রন আবিষ্কারের পর কিরূপে তাহার আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা যায়, সে বিষয়ে ব্ল্যাকেট্ ও রসি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহুদূরবর্তী আকাশ হইতে যে সকল মেসোট্রন পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রাভিমুখী, বায়ুমণ্ডলে তাহাদের গমনপথের দৈর্ঘ্য অপর সকল তির্যক্‌গামী মেসোট্রনের পথ অপেক্ষা কম হইবে। ১৩শ চিত্রে দর্শিত



চিত্র ১৩—লম্ব ও তির্যক্ ভাবে আগত রশ্মির পথ

বায়ুমণ্ডলের **ক খ** স্তরে উৎপন্ন এবং **কগ** ও **খগ** পথে ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান মেসোট্রনগুলির মধ্যে **খগ** পথের দৈর্ঘ্য **কগ** অপেক্ষা অধিক বলিয়া শেষোক্ত মেসোট্রনগুলির অধিকতর সংখ্যা পথে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং একটি যুগপৎ ত্রিনলভেদন-গণক যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত দুই দিক হইতে আগত মেসোট্রনের সংখ্যা গণনা করিলে তাহা হইতে মেসোট্রনের আয়ুষ্কাল নির্ণয়

করা যায়। এতদ্ব্যতীত, যদি ভূ-পৃষ্ঠে এবং অত্যুচ্চ স্থানে আপতিত মেসোট্রনের সংখ্যা দুইটি মাপা হয়, এবং শেষোক্ত স্থানে কেবল এক বিশেষ বেধবিশিষ্ট কোন কঠিন পদার্থ ভেদকারী মেসোট্রনের সংখ্যাই নিরূপণ করা হয়, তাহা হইলে এই দুই সংখ্যা হইতেও মেসোট্রনের আয়ুষ্কাল হিসাব করা যায়। প্রথমোক্ত উপায়ে ব্ল্যাকেট্, পোমেরাঞ্জ (Pomerantz) ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ, এবং উভয় প্রণালীতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাসগুপ্ত ও ভট্টাচার্য (N. N. Das Gupta and P. C. Bhattacharyya) মেসোট্রনের জীবনকাল নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কাল প্রায় ২×১০^{-৬} সেকেণ্ড। মেঘকক্ষে মেসোট্রনের গমনপথের আলোকচিত্রে উইলিয়ম্স্ (Williams) একটি মেসোট্রন স্বতোবিশ্লিষ্ট হইয়া ইলেকট্রন ও তড়িৎহীন কণায় পরিণত হইতেছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই স্থলে বলা প্রয়োজন যে, নভোরশ্মির যেগুলি ইলেকট্রন অথবা গামারশ্মির ন্যায় বিকিরণ, তাহার অধিকাংশই দুই ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট সীসক-ফলক ভেদ করিয়া নির্গত হইতে অক্ষম, কিন্তু মেসোট্রনগুলি তাহা অনায়াসে অতিক্রম করে। সুতরাং যদি এইরূপ সীসকফলক ভেদনে সমর্থ রশ্মির পরিমাণের সহিত অসমর্থ রশ্মির পরিমাণ তুলনা করা হয়, তাহা হইলে আপতিত সমস্ত রশ্মির মধ্যে মেসোট্রনের অংশ নির্ণয় করা যায়। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠে আপতিত নভোরশ্মির শতকরা ৭০ ভাগ মেসোট্রন, তাহাদের মধ্যে নেগেটিভ ও পজিটিভ তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন প্রায় সমসংখ্যক।

নভোরশ্মিজনিত বিস্ফোরণ ও দূরব্যাপী বর্ষণ

পূর্বে বলা হইয়াছে যে নভোরশ্মির ইলেকট্রনগুলি পদার্থ ভেদনকালে প্রপাতবর্ষণের প্রণালীতে বহু ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি করিতে পারে। উৎপন্ন হওয়ার পর তাহারা সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখে ধাবমান হয়। ১০ম চিত্রে এইরূপ একটি বর্ষণের মেঘকক্ষে গৃহীত আলোকচিত্র দর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার বর্ষণে যে ইলেকট্রন ও পজিট্রন সকল উৎপন্ন হয় তাহাদের সম্মিলিত শক্তি আপতিত নভোরশ্মির ইলেকট্রনটির শক্তির সমান। সুতরাং কোনও বর্ষণে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলির শক্তি যদি চৌম্বকক্ষেত্রে তাহাদের পথের বক্রতা হইতে নির্ণীত হয়, তাহা হইলে বর্ষণ উৎপাদক রশ্মিটিরও শক্তি জানা হয়। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ওজে (Auger) প্রথম লক্ষ্য করেন যে উক্ত প্রকার কোন কোন বর্ষণ বহুদূর পর্যন্ত বারংবার ঘটে, এবং প্রত্যেক বার অসংখ্য ইলেকট্রন ও পজিট্রন উৎপন্ন হয়। যদি দুইটি মেঘকক্ষের একটিকে আর একটির অন্তরালে কিছুদূরে স্থাপন করা হয় এবং কয়েকটি গণকনলদ্বারা তাহাদিগকে এরূপভাবে ক্রিয়াশীল করা যায় যে, যখনই উভয় মেঘকক্ষে যুগপৎ ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন প্রবেশ করিবে তৎক্ষণাৎ উভয় মেঘকক্ষেই মেঘ উৎপন্ন হইবে ও তাহার আলোকচিত্র স্বতঃই গৃহীত হইবে, তাহা হইলে এইরূপে গৃহীত আলোকচিত্রে অনেক সময় উভয় মেঘকক্ষেই বহুসংখ্যক ইলেকট্রন ও পজিট্রনের গমন পথের চিহ্ন দেখা যায়। ব্ল্যাকেট্ ও রসি (Blackett and Rossi) এইরূপ কয়েকখানি আলোকচিত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন। উভয় কক্ষে যুগপৎ প্রবিষ্ট এই ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলি মেঘকক্ষের বহিঃস্থ বায়ুতে উৎপন্ন বিরাট বর্ষণের অংশমাত্র।

কোন কোন বর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণুগুলি মেসোট্রনও হইতে পারে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফুসেল (Fussell) এইরূপ বর্ষণের

বহুসংখ্যক আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকার মেসোট্রনবর্ষণ ভাবা ও হাইটলারের পরিকল্পিত প্রণালীতে হইতে পারে না। বর্ষণে উৎপন্ন মেসোট্রনের সংখ্যা অধিক নহে, দুই হইতে সাতটি পর্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ অল্পসংখ্যক মেসোট্রন বর্ষণ কি প্রণালীতে হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়াছেন। বুথ ও উইলসন (Booth and Wilson) এবং ভাবা ও রাও (Bhabha and Rao) উচ্চশক্তিশালী গামারশ্মি ও মেসোট্রন পদার্থ ভেদনকালে কিরূপে একাধিক মেসোট্রনের সৃষ্টি করিতে পারে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করিয়াছেন। হ্যামিল্টন, হাইটলার ও পেং (Hamilton, Heitler and Peng) এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দ্রুতগামী প্রোটন অথবা নিউট্রন পদার্থ ভেদনকালে উপর্যুপরি কয়েকটি মেসোট্রন উৎপাদন করিয়া মেসোট্রন বর্ষণের সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রণালীতে উৎপন্ন বর্ষণেও ছয় সাতটির অধিক মেসোট্রন উৎপন্ন হয় না।

অনেক বর্ষণের মধ্যে লক্ষিত হয় যে জড়পদার্থের প্রায় একটি বিন্দু হইতে যুগপৎ বহুসংখ্যক মেসোট্রন ও ইলেকট্রন উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইয়াছে। ১৪ শ চিত্রে মেঘকক্ষে এইরূপ একটি ঘটনার আলোকচিত্র দর্শিত হইয়াছে। প্রপাত-বর্ষণে উৎপন্ন ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলি বর্ষণোৎ-পাদক ইলেকট্রন যে অভিমুখে ধাবমান হয় তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত হয় না, কিন্তু ১৪শ চিত্রে দেখা যাইতেছে যে সীসকখণ্ডের উপরের দিক্ হইতে আপতিত রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন বর্ষণের মধ্যে কতকগুলি তড়িৎযুক্ত সূক্ষ্মপরমাণু সীসকখণ্ডের উপর দিকেও ধাবমান হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি রেখা আবার অন্যগুলি অপেক্ষা স্থূলতর, উহারা পূর্বোক্ত মেসোট্রনজাত হইতে পারে। এই জাতীয় বর্ষণ পূর্বোক্ত দুই প্রণালীর কোনটিতেই ঘটিতে পারে না, সেজন্য ইহাকে পৃথক্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমরা ইহাকে বিস্ফোরণ (explosion) বলিব। কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের বিস্ফোরণের

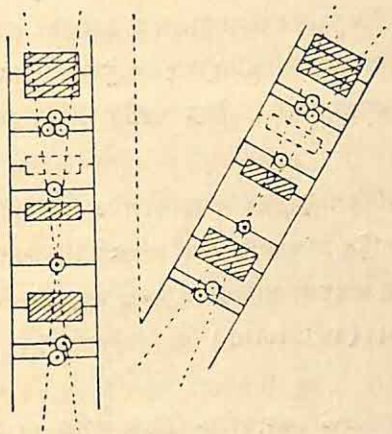
জন্য যেমন তাহাকে একটি বিশেষ অবস্থায় উত্তেজিত করিতে হয়—বারুদকে যেমন উত্তপ্ত করিতে হয়—সেইরূপ জড়পদার্থের বিস্ফোরণের জন্য নভোরশ্মির সহিত তাহার পরমাণুর সংঘর্ষেরপ্রয়োজন হয়। এরূপ বিস্ফোরণ যে মেসোট্রনের সহিত বায়ুর পরমাণুর সংঘর্ষেও ঘটিতে পারে তাহা বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে সিংহ (M. S. Sinha) মেঘকক্ষে উৎপন্ন একটি বর্ষণের আলোকচিত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। উক্ত মেঘকক্ষ দ্রুতগামী ইলেকট্রনের পক্ষে অভেদ্য এক পুরু সীসকপট্ট দ্বারা আবৃত ছিল, অথচ মেঘকক্ষে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে দেখা যায় যে তন্মধ্যে অতি অল্পপরিসর স্থান হইতে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন, পজিট্রন ও সম্ভবতঃ কতকগুলি মেসোট্রন চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই বিস্ফোরণ কক্ষেপ্রবিষ্ট নভোরশ্মির কোন মেসোট্রন দ্বারাই সংঘটিত। আলোকচিত্র গ্রহণে ব্যবহৃত ফিল্মের উপর এইরূপ বিস্ফোরণের প্রমাণ টেলর (Taylor) এবং বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের বসু ও চৌধুরী পাইয়াছেন। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পর্বতোপরি রক্ষিত ফিল্ম উপযুক্ত রাসায়নিক দ্বারা ধৌত করিয়া শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে একই বিন্দু হইতে প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন মেসোট্রনের গমনপথ তারকার কিরণের ন্যায় চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এইগুলি যে প্রোটন অথবা মেসোট্রন দ্বারা উৎপন্ন ইহাও এই ফিল্ম হইতে বুঝা যায়। এইরূপ বিস্ফোরণের তত্ত্ব সম্বন্ধে হাইসেনবার্গ (Heisenberg) গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু বিস্ফোরণে যেরূপ বহুসংখ্যক মেসোট্রন ও ইলেকট্রন যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হাইসেনবার্গের পরিকল্পিত প্রণালীর সাহায্যে বোধগম্য হয় না।

নভোরশ্মির তড়িৎবিহীন অংশ

নভোরশ্মিতে ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসোট্রন ও শক্তিশালী গামারশ্মি বর্তমান, ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। আরও অন্য প্রকার দ্রুতগামী সূক্ষ্মপরমাণুও ইহাতে লক্ষিত হয়। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক কর্ফ্ (Korff) পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, ভূপৃষ্ঠে আপতিত নভোরশ্মির মধ্যে অতি সামান্য অংশ বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর বেগবিশিষ্ট নিউট্রন। ভূপৃষ্ঠ হইতে অল্প উর্ধ্বে ঐরূপ নিউট্রনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এ বিষয়ে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে চ্যাটার্জিও (S. D. Chatterjee) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বায়ব অণুর সমবেগবিশিষ্ট নিউট্রনের পরিমাণ কলিকাতা অপেক্ষা দার্জিলিং পর্বতের উপর চারিগুণ অধিক। সম্প্রতি কর্ফ বেলুনের সাহায্যে অতি উর্ধ্বে উপযুক্ত যন্ত্র প্রেরণ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে তথায় এরূপ সামান্য বেগসম্পন্ন নিউট্রন নাই। তথায় অতিশয় বেগবান্ নিউট্রন লক্ষিত হয়। তবে যতই উর্ধ্বে উত্থিত হওয়া যায় ততই নিউট্রনের সংখ্যা অধিক হয় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ফ আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে উর্ধ্বদিকে যেরূপ হারে নিউট্রনের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, নভোরশ্মির বিস্ফোরণও সেই হারে বর্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে এই নিউট্রনগুলি নভোরশ্মির সংঘর্ষে বায়ব অণুর বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, অন্য প্রণালীতে নিউট্রন কিরূপে নভোরশ্মি দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে, সে সম্বন্ধে অন্যরূপ পরিকল্পনাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক করিয়াছেন, উহা পরে আলোচিত হইবে।

পদার্থ ভেদনকালে তাহার পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ দ্বারা তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন উৎপাদন করিতে পারে এরূপ কোন তড়িৎবিহীন অথচ মেসোট্রন জাতীয় কোন কণা নভোরশ্মির মধ্যে থাকিতে পারে কি না, এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়াছেন। রসি, ইয়ানসি, রোচেস্টার এবং বাউণ্ড

(Rossi, Ianossy, Rochester and Bound) পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উক্তরূপ কোন পরমাণু ভূপৃষ্ঠে আপতিত নভোরশ্মির মধ্যে নাই। পরে রসি ও রেগেনার (Rossi and Regener) প্রায় আড়াই মাইল উচ্চ পর্বতোপরি এইরূপ পরীক্ষা করিয়া লক্ষ্য করেন যে



চিত্র ১৫—লম্ব ও তির্যক্‌ভাবে আপতিত নভোরশ্মির তড়িৎহীন কণা দ্বারা সীসকখণ্ডে মেসোট্রন উৎপাদনের হার গণক যন্ত্র

তথায় নভোরশ্মির মেসোট্রন-সংখ্যার শতকরা এক অংশে এরূপ তড়িৎবিহীন কণা আছে। ইহারা পদার্থ ভেদনকালে মেসোট্রন উৎপন্ন করিতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও ঘোষ (S. C. Sirkar and S. K. Ghosh) রসিপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের যন্ত্র হইতে একটু পৃথক্ এক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষার ফলে এই অনুমান করেন যে কলিকাতায় ভূপৃষ্ঠে প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি মেসোট্রন নভোরশ্মির মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহার প্রায় শতকরা দুইভাগ তড়িৎবিহীন এরূপ সূক্ষ্মপরমাণু যাহারা দুই ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট সীসকফলক ভেদনকালে তন্মধ্যে দ্রুতগামী তড়িৎযুক্ত মেসোট্রনের সৃষ্টি করিতে পারে।

ইহার পরে সরকার ও ভট্টাচার্য (S. C. Sirkar and P. K. Bhattacharyya) উল্লিখিত যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে উক্ত তড়িৎবিহীন কণা তড়িৎযুক্ত মেসোট্রনের শতকরা ১·৪ অংশ। নূতন যন্ত্রটির সাহায্যে তাঁহারা আরও লক্ষ্য করেন যে, লম্ব ঊর্ধ্বদিক্ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে আগত তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন অপেক্ষা তির্যগ্‌ভাবে আগত মেসোট্রন যেমন স্বতোবিশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য সংখ্যায় কম, সেইরূপ এবং সেই অনুপাতেই ঊর্ধ্বদিক্ হইতে আগত তড়িৎবিহীন মেসোট্রনগুলির সংখ্যা অপেক্ষা তির্যক্‌ভাবে আগত সংখ্যা ন্যূনতর। উক্ত যন্ত্রটির প্রধান অংশগুলি ১৫শ চিত্রে দর্শিত হইল।

উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহ হইতে সরকার ও ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেন যে, সীসক খণ্ডে মেসোট্রন উৎপাদনে সক্ষম তড়িৎবিহীন কণাগুলি স্বতোবিশ্লেষণশীল, ও তাহাদের আয়ুষ্কাল প্রায় মেসোট্রনের আয়ুষ্কালেরই সমান। ইহাদিগকে তাঁহারা নয়ট্রেটো (neutretto) বা তড়িৎবিহীন মেসোট্রনরূপে গণ্য করিয়াছেন।

ইয়ানসি ও রোচেস্টারও সরকার-ভট্টাচার্য কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্র হইতে একটু ভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের সাহায্যে এই তড়িৎবিহীন কণার পরীক্ষা করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে তাঁহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রে নিরূপিত প্রতি সেকেণ্ডে ঐরূপ সূক্ষ্মপরমাণুর আগমনের সংখ্যা তড়িৎযুক্ত মেসোট্রনের সংখ্যার সার্ধ দ্বিসহস্র অংশের একাংশ। এই তড়িৎবিহীন কণাগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কোন পরীক্ষা করেন নাই, সুতরাং স্বভাবতঃই অনুমান করেন যে ইহারা নিউট্রন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাঁহাদের যন্ত্রে যুগপৎ চতুর্নল-ভেদন গণকরূপে ব্যবহৃত গাইগার-মুইলার গণকনলগুলি অপর কতকগুলি গণকনল দ্বারা এরূপ সম্পূর্ণভাবে আবৃত ছিল যে, যদি আপতিত তড়িৎবিহীন কণাগুলি একখণ্ড সীসক ভেদকালে যুগপৎ একটি তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন ও দ্বিতীয় একটি ঐরূপ মেসোট্রন অথবা একটি দ্রুতগামী ইলেকট্রন উৎপাদন করে, তাহা হইলে

তাঁহাদের যন্ত্রে কোন ক্রিয়া হইবে না; অর্থাৎ ঐরূপ তড়িৎবিহীন কণাগুলি তাঁহাদের যন্ত্রে গণিতই হয় নাই। পক্ষান্তরে সরকার ও ঘোষ এবং সরকার ও ভট্টাচার্য দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রে সমস্তই গণিত হইয়াছে।

এই দুইটি পৃথক্ উপায়ে অনুসন্ধানের ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তড়িৎবিহীন মেসোট্রন নভোরশ্মিতে বর্তমান, তাহারা স্বতোবিশ্লেষণশীল, এবং সীসকখণ্ড ভেদনকালে তাহারা যুগপৎ একাধিক তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন অথবা একটি মেসোট্রন ও একটি ইলেকট্রন উৎপাদন করে। হ্যামিল্টন, হাইটলার ও পেং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মূল নভোরশ্মি বস্তুতঃ দ্রুতগামী প্রোটনের সমষ্টি মাত্র, ইহারাই বায়ব অণুর সহিত সংঘর্ষে নিউট্রন ও মেসোট্রনের সৃষ্টি করে। এই মেসোট্রনের প্রায় অর্ধেকগুলি তড়িৎযুক্ত এবং অর্ধেকগুলি তড়িৎবিহীন। ইঁহাদের পরিকল্পনার সাহায্যে সপ্রমাণ হয় যে তড়িৎবিহীন মেসোট্রনের বেগজনিত শক্তি ত্রিশ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক হইলে পদার্থের পরমাণুর সহিত সংঘর্ষের ফলে তড়িৎযুক্ত মেসোট্রন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই নব পরিকল্পনার সাহায্যে জানা যায় না যে তড়িৎবিহীন মেসোট্রনগুলি স্বতোবিশ্লেষণশীল কি না, বা তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া ইলেকট্রনে পরিণত হইতে পারে কি না। গামারশ্মি হইতে যেরূপ বিপরীত তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ তড়িৎবিহীন মেসোট্রন হইতে বিপরীত তড়িৎযুক্ত দুইটি মেসোট্রনের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ এইরূপ তড়িৎবিহীন লঘুভার মেসোট্রন হইতে যে উক্ত প্রকার যুগ্মকণা উৎপন্ন হইতে পারে, সম্প্রতি আমেরিকার গ্রোয়েট্‌জিংগার, ক্রুগার ও স্মিথ (Groetzinger, Kruger and Smith) তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহাদের লক্ষিত লঘুভার মেসোট্রন সাইক্লোট্রনে (Cyclotron) উৎপন্ন, অতিদ্রুতগামী, এবং প্রায় এককোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকের সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে।

নভোরশ্মির উৎপত্তিপ্রণালী সম্বন্ধে পরিকল্পনা

নভোরশ্মি কি প্রণালীতে আকাশের সর্বত্র অবিরত উৎপন্ন হইতেছে তাহা অবগত হওয়ার জন্য প্রথমে বৈজ্ঞানিকগণ যে মূলরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রন, পজিট্রন ও মেসোট্রনের সৃষ্টি করিতেছে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। পশ্চিমগগন হইতে তির্যগ্‌ভাবে পৃথিবীর দিকে ধাবমান ইলেকট্রনের গতির উপর পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবের সহিত পূর্বগগন হইতে আপতিত ইলেকট্রনের গতির উপর এইরূপ প্রভাবের তুলনা করিয়া প্রথমে রসি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মূল নভোরশ্মি যদি কেবলমাত্র দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সমষ্টি হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন এবং পশ্চিমগগন হইতে তির্যগ্‌ভাবে ভূপৃষ্ঠে প্রতি সেকেণ্ডে আগত ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসোট্রন প্রভৃতির পরিমাণ পূর্বগগন হইতে আগত পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হইবে, পক্ষান্তরে যদি মূলরশ্মি কেবলমাত্র পজিট্রন হয় তাহা হইলে পশ্চিমগগন হইতে ঐরূপ আপতিত রশ্মির পরিমাণ পূর্বগগন হইতে আপতিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। পরে এ বিষয়ে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে জন্‌সন্ ও স্ট্রীট (Johnson and Street), আল্‌ভারেজ ও কম্পটন (Alvarez and Compton), ওজে ও ল-প্রিন্স-রিংগে (Auger and Le prince-Ringuet), এমার্ট (Ehmert), কর্ফ (Korff), মেসারশ্মিড্ (Messerschmidt), রসি (Rossi), সাইড্‌ল্ (Seidl), ষ্টিভেন্‌সন (Stevenson), পাঞ্জাবী বৈজ্ঞানিক গিল্ (P. S. Gill) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভট্টাচার্যের (P. C. Bhattacharyya) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমগগনে যে দিক্ লম্বোর্ধ্ব দিকের সহিত ৩০° কোণ উৎপন্ন করিয়াছে, সেই দিক্ হইতে আগত রশ্মির পরিমাণ পূর্বগগনের ঐরূপ দিক্ হইতে আগত রশ্মির পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ অধিক। সুতরাং রসির পরিকল্পনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে মূল অতিভেদীরশ্মি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত দ্রুতগামী কণার সমষ্টি।

সম্প্রতি জন্‌সন বেলুনের সাহায্যে বহু উর্ধ্বে যন্ত্র প্রেরণ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বায়ুমণ্ডলের বহু উর্ধ্বদেশে নভোরশ্মিতে প্রোটনের সংখ্যা উচ্চতার সহিত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই অনুমান করেন যে বায়ুমণ্ডলে আপতিত মূল নভোরশ্মি দ্রুতগামী প্রোটনের সমষ্টি।

মূল নভোরশ্মির উৎপত্তিপ্রণালী সম্বন্ধে মিলিকান (Millikan) এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন যে, আকাশের শূন্য প্রদেশের সর্বত্র যে অতিশয় অল্প পরিমাণ হিলিয়ম, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও সিলিকনের (silicon) পরমাণু পাওয়া যায়, অবিরত তাহাদেরই কোন না কোন একটির সমগ্র জড়ভার আইনস্টাইনের নিয়ম অনুসারে উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি ও তাহা হইতে প্রপাতবর্ষণ দ্বারা দ্রুতগামী ইলেকট্রন ও দ্রুতগামী পজিট্রনে পরিণত হওয়ায় নভোরশ্মির উদ্ভব হইতেছে। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার পরমাণু হইতে এই প্রণালীতে উৎপন্ন নভোরশ্মির শক্তি যথাক্রমে ১৮৮, ৫৬০, ৬৬০, ৭৫০ ও ১৩২০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান ইলেকট্রনের শক্তি ২০০০ কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট অপেক্ষা অধিক না হইলে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তাহার গতিপথের পরিবর্তন ঘটিবে, এবং তাহার ফলে উহা মেরু-প্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চৌম্বকক্ষেত্রের এই প্রভাবের জন্য লম্বোর্ধ্ব দিক্ হইতে আগত হিলিয়মজাত রশ্মি ৫৪°, কার্বনজাত রশ্মি ৪২°, নাইট্রোজেনজাত রশ্মি ৩৯.৫°, অক্সিজেনজাত রশ্মি ৩৩.৫° ও সিলিকন-জাত রশ্মি ২০° চৌম্বক অক্ষবৃত্তস্থ স্থান অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে পৌঁছিতে পারে না। যদি সত্যই এইরূপ পরমাণুভরের বিকিরণে পরিণতিজনিত উক্ত কয়েক প্রকার নির্দিষ্ট শক্তিবিশিষ্ট অংশ নভোরশ্মিতে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বিষুব রেখার নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে ক্রমশঃ মেরুপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইলে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আপতিত নভোরশ্মির পরিমাণ ১৯° পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে, কিন্তু ২০° চৌম্বক অক্ষবৃত্তস্থ স্থানে পৌঁছিলে পরে উহা

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. [illegible]

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	শেষ	এক-শতাংশ	এক-দশাংশ
২৫	১২	অতিভেদীরশ্মির	নভোরশ্মির
২৯	১০	রশ্মি	রাশি
৩০	৭	Block	Bloch
৩৫	১	ন্যার	ন্যায়
৪১	১	Ianossy	Janossy
৪৭	৪	সিলিকন	ইউরেনিয়ম

২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ